প্রকাশকের নিবেদন

পূজনীয় গ্রন্থকর্ত্তার সামাজিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিবার সময় পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে "বাবুর গঙ্গাযাত্রা" ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—আধুনিককালে তাহার প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে যদিও, তবু পুরাকালে সেই সকল ব্যধির প্রকোপাবস্থায় সেগুলি সমাজের গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার যে কী একান্ত আগ্রহ লেখকের ছিল তাহাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জাজ্জল্যমান। বর্ত্তমান কালের অনেক সামাজিক সমস্যার মিমাংসাও এই সকল রচনার পত্রে পত্রে এখানে-ওখানে লুকাইয়া আছে, সমজদার লোক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

প্রবন্ধ-মালা

—:*:—

মুখ্য এবং গৌণ

বঙ্গ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং কিরূপে তাহার উন্নতি সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্র-সমূহে ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্য কি এবং গৌণ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় অনেকেই ভ্রমে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের দেশে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তাহাই মুখ্য-রূপে গৃহীত হয়। "জাতীয়-ভাব" "উন্নতিশীলতা" "ভারত-জননী" "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এমনি এক একটি কথার উল্লেখ মাত্রেই তাহার এক-একটি কার্য্যাকার্য্যবিচার-নিরপেক্ষ অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থ দুইরূপ—বাক্যার্থ এবং ভাবার্থ; বাক্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা বাক্যার্থই গ্রহণ করেন, কার্য্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা ভাবার্থই গ্রহণ করেন। বাক্যার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার অপ্রাসঙ্গিক; বাক্যের মুখ্য অর্থটিই বাক্যার্থ, তাহার

* [১৭৯৭ শকের (১২৮২ সালের) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে উত্তরোত্তর ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত।]

এদিক্ ওদিক্ হইলেই তাহার অপলাপ ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার নিতান্তই আবশ্যক। উদাহরণ;—"জাতীয় ভাব", এ শব্দটির বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা থাকিতে পারে, এমন কি ভিন্ন জাতির প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগও থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, "স্বজাতির প্রতি আমার অনুরাগ যথেষ্ট আছে, সুতরাং আমি যে, জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না, একথা তুমি বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ;" তবে তাঁহার সে বাক্যে আমরা সায় দিতে পারি না কেন? জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ঠিক্ কথাই বলিতেছেন; কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাঁহার কথা অযথা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেননা জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখ্যরূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ। ইহার বিপরীতে, মুখ্য-রূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্ত্তিলে জাতীয়-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোল্লিখিত "জাতীয়-ভাব" ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রমান্বয়ে মুখ্য-গৌণ নিরূপণ করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্য কার্য্য। সার্ব্বভৌমিক ভাবের নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব স্বীকার করাও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে গেলেই স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহা একটি মাত্র বচন, কিন্তু ইহা হইতে যে যেমন সে তেমনি অর্থ নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়।

এজন্য "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহার অর্থ এত গুলি যথা ;—প্রথম ; স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। দ্বিতীয়, বিজাতীয়-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, এবং স্বজাতীয়-ভাবকে পোষণ করা ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। তৃতীয়, স্বজাতীয়-ভাব এবং বিজাতীয়-ভাব দুইকে সমানরূপে রক্ষা করা। চতুর্থ ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং স্বজাতীয়-ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করা। পঞ্চম ; স্বজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং বিজাতীয় ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি অর্থের মধ্যে শেষোক্তটিই কার্য্যকর, অন্যগুলি সমস্তই অকার্য্যকর। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে চৌকিতে বসিলেই জাতীয়-ভাবের অন্যথাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধ্যয়ন করিলেই জাতীয়-ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে বাঙ্গালি-সমাজে ধুতি-চাদর ও ইংরাজি-সমাজে কোর্ত্তা ও পেণ্ট্‌লন্ পরিধান করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ করিলে জাতীয়-ভাব একেবারেই লোপ পায়। পঞ্চম অর্থটি গ্রহণ করিলে সার্ব্ব-ভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—ইহাই "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" এই বচনটির প্রকৃত অর্থ।

মনুষ্য-জাতি যেমন, পশ্বাদি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্ন। আম্র-বৃক্ষ যেমন জম্বূ-বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে ; সেইরূপ বাঙ্গালি, ইংরাজ, ফরাসিস্, সকল জাতীয় মনুষ্যই মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহা-দের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আম-বৃক্ষে যেমন আম্র-ফলই শোভা পায়, জম্বূ-বৃক্ষে যেমন জম্বূ-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসিস্ জাতির ফরাসি-ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি

জাতির বাঙ্গালি-ভাবই শোভা পায়। অপিচ আম্র-বৃক্ষ যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়া যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল উৎপাদন করে, এবং তাহা না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পৌঁছে, সেইরূপ জম্বূ-বৃক্ষও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল প্রসব করে, না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পৌঁছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসিস্ দেশীয় ব্যক্তি দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্বের হানি হইবে; বাঙ্গালি জাতিও দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সকল জাতিরই আবশ্যক। আম্র বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জম্বূ-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক্ তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেইরূপ, ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ। মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে—এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি জাতীয়-ভাবের উত্তেজনা; বাঙ্গালি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি সার্ব্বভৌমিক ভাবের উত্তেজনা; উভয়ই বাঙ্গালির শিরোধার্য্য। এক্ষণে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধনের পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক।

কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাব সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিলেই সার্ব্বভৌমিক-ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ই রক্ষিত হয়। ইঁহাদের যুক্তি এইরূপ যে, সকল জাতীয়-ভাব যেখানে একত্র করা হইয়াছে, সেখানে স্বজাতীয়-ভাব যেমন আছে বিজাতীয়-ভাবও তেমনি আছে,

সুতরাং জাতীয়-ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক-ভাব উভয়ই রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এটি ভ্রম। একটি আম্র-বৃক্ষে যদি জম্বু-ফল, আতা-ফল, তিন্তিড়ী-ফল একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন বিকারের প্রলাপের সহিত উপমেয় হয়, নানা জাতীয় ভাব একত্র করিলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। জাতীয়-ভাব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য করা কেবল মাত্র বিচারের কার্য্য নহে, উহা শিক্ষা সংস্কার এবং অভ্যাসের কার্য্য। এজন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়ের যেমন বৈশদ্য হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেমন হইতে পারে না। অতএব দৃষ্টান্তচ্ছলে নিম্নে তাহার উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ। বাঙ্গালিদের মধ্যে মনুষ্য * জন্মিয়াছে, এবং মনুষ্য বর্ত্তমান আছে—এটি প্রত্যক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ; এবং ইহা যে বাঙ্গালি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য।

উপরের দুই প্রত্যক্ষ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জিজ্ঞাস্য উপায়টি নিষ্কর্ষণ করাই বৈধ-প্রণালী। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিরা মনে করেন যে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে মনুষ্যত্ব হয়; পোষ্যবর্গ এবং পোষক উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করাতেই মনুষ্যত্ব † রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতাচরণ করা হয়। এ ভাবটি রক্ষা করিয়া চলিলে বাঙ্গালিত্ব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই রক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটি ভাগ রক্ষা করিলেই যে সম্যক্-

---

* এখানে মনুষ্য শব্দের অর্থ যে—মনুষ্যে মনুষ্যত্ব বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পায়।

† ইহা ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যত্ব নহে, ইহা বলা তাৎপর্য্য নয়। সংক্ষেপ-মানসে মনুষ্যত্বের কোন একটি ভাগ (যে ভাগটির প্রতি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ লক্ষ্য তাহাই) দেখান হইল।

রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা হয়, তাহা নহে। সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। বাঙ্গালিরা যেমন স্বার্থ-বিহীন পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে; ইংরাজেরা সেইরূপ স্বাধীন-ভাব রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত দুই ভাবই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, অতএব উভয়ের কোনটিই ত্যজ্য নহে।

কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালিরা বহুকাল হইতে মঙ্গল-ভাবকেই বিশেষরূপে আদর করিয়া আসিতেছেন; ইংরাজেরা স্বাধীনতা-কেই বিশেষরূপে আদর করিয়া আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের বহু যত্নার্জ্জিত স্বাধীনভাব শিক্ষা করিবেন; এবং ইংরাজেরাই বা কিরূপে বাঙ্গালীদের নিকট হইতে তাঁহাদের বহুকালার্জ্জিত মঙ্গলভাব শিক্ষা করিবেন। বাঙ্গালীরা দেশীয় কুসংস্কার উন্মূলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা অতি উত্তম; কিন্তু তাঁহারা দেশীয় সুসংস্কার উন্মূলনেও সমান আগ্রহ প্রকাশ করেন, ইহা অতি নিন্দনীয়। আজকাল সকল বিষয় সমান চক্ষে দেখাই উদারতার চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং আপনাদের উদারতা সাধন করিবার জন্য অনেক সুসংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালীদের অনেক কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু মঙ্গল-অনুষ্ঠান বিষয়ে বাঙ্গালিদের যে অনেক সুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব? বাঙ্গালীদের সমাজে মঙ্গল-ভাবের যখন আদরাধিক্য, তখন সেই ভাবের মধ্য দিয়া কিরূপে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। চিরার্জ্জিত মঙ্গল-ভাবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া যিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাঁহার সে ভক্তি অতি-ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না যিনি মঙ্গল-ভাবের

প্রতি অভক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন স্বাধীনতার ভক্ত হইতে পারেন, এও কি কখনও সম্ভবে? এমন হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবেরই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহার একপ্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে; এজন্য মঙ্গল-ভাবের প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি; এ প্রকার ভক্তির আধিক্য স্বাভাবিক। কিন্তু মনে কর যে, বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিয়াও তাহার প্রতি যাঁহার ভক্তি জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি কি এত মহৎ হইতে পারেন যে, স্বাধীনতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিবামাত্রই তৎপ্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে? স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাব এ দুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা হইলে একের প্রতি অভক্তি এবং অন্যের প্রতি ভক্তির আতিশয্য একত্র শোভা পাইত; কিন্তু স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাবের মধ্যে সেরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক,—একটি আর-একটির সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গলভাবে এবং মঙ্গলভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালীরা আপনাদিগের পৈতৃক ধনস্বরূপ মঙ্গল-ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে ঝম্প প্রদান করেন, ইহা কোন-রূপে যুক্তিসিদ্ধ নহে; বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার উপায় এই :—বাঙ্গালি জাতি যে যে ভাবকে বিশেষরূপে মনুষ্যত্বের চিহ্ন বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, যে যে ভাবের অনুশীলনে তাঁহাদের এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সেই সেই ভাবকে মূল করিয়া অনভ্যস্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন; ইহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব এরূপ নহে যে, মঙ্গল-ভাব অপেক্ষা স্বাধীনতা কোন অংশে ন্যূন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা

মঙ্গল-ভাব কোন অংশে ন্যূন। এখানকার অভিপ্রায় কেবল এই যে, মঙ্গলভাবের অনুষ্ঠানে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন ইহা অতীব উত্তম, কিন্তু তাহা বলিয়া মঙ্গল-ভাবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন কেন? মঙ্গল-ভাবের মধ্য দিয়া কি স্বাধীনতাতে পৌঁছান যায় না? যদি বল "না—পৌঁছান যায় না," তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছ তাহা স্বাধীনতাই নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না—বাঙ্গালির কার্য্যতঃ কিরূপ করা উচিত, তাহাই দেখা যাউক।

বাঙ্গালিদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ইহা জানিয়া যেরূপ করিলে সেই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তাহাই বাঙ্গালিদের কর্ত্তব্য। "প্রকৃত অবস্থা" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আনুমানিক এবং মনঃকল্পিত অবস্থাই সহজে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদিক্রমে বুদ্ধি চালনা এবং শ্রম স্বীকার আবশ্যক হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে হইলে অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র চাই, সেইরূপ বঙ্গ-সমাজের তত্ত্বানুশীলন করিবার অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র আবশ্যক; তাহা এইরূপ;—প্রথমতঃ, বাঙ্গালি-সমাজ ইংরাজি-সমাজ দ্বারা বেষ্টিত, দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালি-সমাজের রীতিনীতি সমস্তই প্রাচীন আর্য্য-বংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়তঃ, মুসলমানদিগের প্রভাব দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটনা।

এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দেখা যাউক্ যে, হিন্দু মুসলমান ইংরাজ এই তিন জাতি কী-তিন ভাবে বঙ্গসমাজের দশা-চক্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা মঙ্গল-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, মুসলমানেরা বল-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন,

ইংরাজেরা স্বাধীনতা-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালি-সমাজের মধ্যে মঙ্গল-প্রধান ভাব এবং বল-প্রধান ভাব স্ব স্ব কার্য্য করিয়া অবসর লইয়াছে, এক্ষণে স্বাধীনতা-প্রধান ইংরাজী ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে। যাহা বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার দুই একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের ব্যবস্থাতে আর যে কিছুর ক্রটি থকুক্ না কেন, কিন্তু উক্ত বিধান-কর্ত্তাদিগের মঙ্গল-ভাবের কোনো অংশে ক্রটি ছিল না। তাঁহারা যে কোনো বিষয় উপকারী জানিতেন, তাহা কিরূপে জন-সাধারণের ভোগে আসিবে, যে কোনো কার্য্য হিতকারী জানিতেন তাহা কিরূপে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, যে কোনো অনুষ্ঠান শুভ-জনক জানিতেন তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা জন্মিবে, এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগিত। সামান্য গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা দেখিলেই তিন জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারিবে। গৃহ ধর্ম্ম বিষয়ে মন্বাদি ঋষিগণের ব্যবস্থা সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—মাতা-পিতাকে দেবতুল্য জানিবে, স্ত্রীকে স্বামী ভরণ পোষণ করিবে, ছায়ার ন্যায় পত্নী পতির অনু-বর্ত্তী হইবে, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে, কন্যাগণকেও অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে; দাস-বর্গ ছায়ার ন্যায়, দুহিতা কৃপা-পাত্র, অতএব এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সংযত হইয়া সমস্ত সহ্য করিবে ইত্যাদি। ইহাতে কেমন মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ব্যবস্থা যে বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই ধরা পড়ে; ঋষিগণের ব্যবস্থাতে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা "কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে," "স্ত্রী গৃহের শ্রী-স্বরূপা" ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা স্ত্রীজাতিকে অপেক্ষাকৃত হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। যাঁহারা বলের পক্ষপাতী তাঁহারা দুর্ব্বল অবলা জাতিকে হেয় জ্ঞান করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? কেবল যাঁহারা মঙ্গলের

অনুরাগী তাঁহারাই স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধ্যেও স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির বল দেখিতে পা'ন। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিছু অতিরিক্ত; তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুগামী হইবে।" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।" এরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা—স্বাধীনতার অন্তিম দশা, উহা কখনই আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাঙ্গালি-সমাজে যে-কিছু মঙ্গল-ভাবের চর্চ্চা অদ্যাপি চলিতেছে তাহা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রসাদাৎ। অনতিপুরাকালে বলবানের আনুগত্য ও দুর্ব্বলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাহা দেখা যাইত, তাহা মুসলমানদিগের প্রসাদাৎ। এবং এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চ্চা চলিতেছে তাহা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে বাঙ্গালীদের কিরূপ ভাবে চলা কর্ত্তব্য, তাহা দেখা যাউক। বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ;—স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গলপ্রধান ভাবের প্রতি, বাঙ্গালীদের নিতান্তই অনাদর জন্মিয়াছে; বলপ্রধান ভাবের প্রতি তদপেক্ষা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি লোকের একটা বিপরীত ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা—যাহার সহিত মঙ্গল-ভাবের যোগ আছে; প্রত্যুত মূল-ছাড়া শাখার ন্যায় যে স্বাধীনতা মঙ্গলভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে স্বাধীনতা প্রকৃত নহে—সে স্বাধীনতা বিকৃত, তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সঙ্গত। এরূপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে।

ইংরাজ জাতিরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাই, স্বাধীনতা লাভের যে কিরূপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"—ইহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল-ভাবের পরিস্ফুটন দ্বারা তাঁহারা স্বহস্তে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের স্বাধীনতা

যদিও স্থলবিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে পরাণুকারিতা ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপাটী উপকরণ-সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু যেরূপ প্রকরণ দ্বারা সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় তাহা দেখেন না। তাঁহারা ইংরাজদিগের স্বাধীনতা মাত্র দেখেন এবং তাহাতেই এমনিই মুগ্ধ হন যে, কি প্রকরণ দ্বারা ইংরাজেরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা উপার্জ্জন করেন, তাহা দেখিতে তাঁহাদের ভার বোধ হয়। ইংরাজেরা যখন ম্যাগনাচার্টা নামক নিয়মপত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মঙ্গল-ভাব কেমন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; রাজার অত্যাচার হইতে ক্ষুদ্র প্রজাদিগকে বাঁচাইবার জন্য, প্রধান প্রধান দলপতিরা যে মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন—ইহা মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদাহরণস্থল বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল মহৎ দৃষ্টান্ত কেন উল্লেখ করিতেছি? যাঁহারা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে বা ইংলণ্ডে স্বাধীনতার গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে যা'ন, তাঁহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে ঐ প্রকার স্বদেশপ্রেমী নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন সম্পর্ক আছে? নৈসগিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা কী, তাহা যদি জানিতে চাও তবে পুরু-রাজা বন্ধনদশায় আলেক্‌জাণ্ডরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা জানিতে তোমার বিলম্ব হইবে না। তোমরা কতকগুলি চাকচিক্য দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া যাও—তোমরা যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল হইলে, তবে যাঁহারা তাহাতে না ভুলেন, যাঁহারা পুরু-রাজার ন্যায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা করেন তাঁহারা এ-ছার দেশে জন্মিলেন কেন? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা-ভক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ পরিত্যাগ

করিয়া, ইংরাজিত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কি স্বাধীন? এক প্রকার স্বাধীন বটে, তিনি ইচ্ছামতে পান ভোজন করিতে পারেন, ইচ্ছামতে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি এই পর্য্যন্ত। স্বাধীনতা কত না উচ্চ মূল্যের সামগ্রী! স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে কত রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে; স্বাধীনতার জন্য লোকে কতদিন উপবাস করিয়াছে; ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে কত সুখে বঞ্চিত করিয়াছে; কত কঠোর তপস্যা করিয়াছে; বিষয়সুখের প্রলোভন হইতে মনকে কত বল পূর্ব্বক উচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে; কেবল অন্তরের মহত্ত্বের জন্য বাহ্যিক সকল প্রলোভন, সকল সুখ-সম্পত্তি, অট্টালিকা পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে! সে সকল গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কী? না "আমি স্বাধীন দেশবিশেষে পদার্পণ করিয়াছি—সুতরাং আমি স্বাধীন!" এই প্রকার স্বাধীন যুবা মনে মনে বলেন, "ইহাই কি সুখের বিষয় নয় যে, ইংরাজেরা এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনাদের করিয়া লইতেছি! আমরা কী বুদ্ধিমান্! আমাদের ধীশক্তি কী চমৎকার! ইংরাজেরা এত বুদ্ধিবিদ্যা ব্যয় করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পণ্যসামগ্রীতে বিপণী সাজাইয়া রাখিয়াছে, আমরা কেবল মুদ্রা মাত্র ব্যয় করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমাদের কি সৌভাগ্য!"

এক্ষণে বঙ্গযুবকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া মঙ্গল-ভাবের যথাসাধ্য অনুশীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা ঐক্য এবং মনুষ্যত্ব সকলই তোমার হস্তগত হইবে। যখন পিতামাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে, ভ্রাতৃগণের সহিত যথোচিত সদ্ভাব রাখিবে, স্ত্রী পুত্রকন্যা সকলের প্রতি কর্ত্তব্যানুযায়ী ব্যবহার করিবে, যখন স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইবে,—স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতিনীতি, যে সকল জ্ঞানগর্ভ উক্তি,

যে সকল উদার ব্যবস্থা, সে সকলকে যখন প্রাণতুল্য জানিবে,—স্বদেশের যে সকল আচার-ব্যবহার নিন্দনীয় জানিবে তাহা বিনা আড়ম্বরে (যত সহজ-ভাবে হয়) যখন পরিত্যাগ করিবে, স্বদেশের পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের প্রতি যখন সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে; এইরূপে যখন চলিবে, তখন দেখিবে যে, স্বাধীনতার জন্ম চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া তোমাদের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবেন। যাঁহারা মঙ্গল-ভাব ছাড়িয়া স্বাধীন হইতে চান, এবং যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চান, উভয়েই সমান! হইব স্বেচ্ছাচারী, বলিব স্বাধীন, এ ভাব পূর্ব্বে ছিল না, এ ভাব একটি নূতন সৃষ্টি। স্বাধীন-ভাবের অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু "স্বাধীনতা" নামটির বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমা-দের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের যেরূপ আত্ম-নির্ভর ছিল, পরানুকরণে তাঁহাদের যেরূপ অপ্রবৃত্তি ছিল, এবং ইংরাজদিগের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই আইস আমরা অনুকরণ করি; আহার-পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের পবিত্র পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত না করি। কার্য্যে অনুকরণ-প্রিয়তা, এবং বাক্যে অনুবাদ-প্রিয়তা, এ দুটি থাকিতে, আমরা স্বাধীনতাই বলি আর উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেই ঠিক হয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ—ইংরাজি চাকচিক্যের অধীনতা. এবং উন্নতির আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের শ্রী, বিদ্যা এবং কল্যাণ এই তিনের প্রতি যে কতদূর যত্ন ছিল তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, অথচ তাহার প্রতিই আমরা অন্ধ, পরন্তু তাঁহাদের যে সকল দোষ ছিল তাহারই আলোচনাতে আমরা অত্যন্ত পটু হইয়াছি; সে দোষগুলি যদি পরি-ত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্য্য করি,—সে দিকে আমরা একই

না; কেবল আলোচনাই করি; কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ রঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার মানসে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা ক্রীড়াচ্ছলে তাহা আলোচনা করেন —জানেন না যে অনর্থক আপনাদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের বীজ বপন করা মাত্র। সংশোধন-মানসে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র, আর ক্রীড়াচ্ছলে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র। দোষ-সংশোধন-মানসে যাঁহারা বঙ্গ-সমাজের দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যদি অল্পাংশ দোষ কীর্ত্তন করেন তবে অধিকাংশ গুণ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু ক্রীড়াচ্ছলে যাঁহারা দোষ কীর্ত্তন করেন তাঁহারা শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাঁহারা একটি মাত্রও দেখিতে পা'ন না। এইরূপ দোষ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীরা নিরুৎসাহ নির্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গল-প্রধান ভাব যে কত যত্নের ধন, তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম স্বাধীনতার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। মুখ্যরূপে মঙ্গল-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই কালে বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। "আমি কিছু মানি না" বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে; তাহার নাম বিশৃঙ্খল ভাব; পুত্র যদি পিতাকে না মানে, স্ত্রী যদি স্বামীকে না মানে, লোকেরা যদি পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মাহাত্ম্য সকল বিস্মৃত হয়, সৈন্যেরা যদি সেনাপতিকে অমান্য করে, তবে তাহাকে কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? যে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, সেই অবস্থায় সেই খানে সেই সময়ে তাহা করা— ইহারই নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালীদের দেশ কাল অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে, স্বজাতীয় ভাব, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাব অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালীদের মুখ্য কর্ত্তব্য; বিজাতীয় ভাবের (তীব্র স্বাধীন ভাবের) অনুশীলন আপাতত গৌণকল্প—কিন্তু ভবিষ্যতে যখন

আমরা মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিব, মঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় ভাবের প্রতি যখন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠা জন্মিবে, তখন স্বাধীনতা মুখ্যরূপে অবলম্বনীয় হইবে।—এটি আপনা আপনি হইবে।

যাহা বলা হইল তাহা এই,—প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলা উচিত; দ্বিতীয়তঃ মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করাই সেই সামঞ্জস্য সাধনের উপায়; তৃতীয়তঃ বঙ্গসমাজের এইরূপ একটা বিকৃত ভাব দাঁড়ইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি,—বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেখা-দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন—স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুক পক্ষীও বক্তৃতাবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালীদের মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখ্য এবং গৌণের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। লক্ষ্য যদি আমাদের স্বাধীনতা হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। লক্ষ্য যদি আমাদের সার্ব্বভৌমিক ভাব হয়, তাহার উপায় মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন। এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। যাঁহারা সার্ব্বভৌমিক ভাবে উঠিবার জন্য নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, স্বজাতীয় ভাবের মুখ্য আলোচনা-রূপ

সোপান ব্যতিরেকে কোনরূপেই সার্ব্বভৌমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা যায় না। অগ্রে যে মুখ্যরূপে আপনাকে বা স্বজাতিকে জানে, সেই-ই গৌণরূপে অন্যকে বা অন্য জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখ্যরূপে আপনাকে আর গৌণরূপে অন্যকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্ব্বভৌমিক এবং কি ব্যক্তি-গত তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, "শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম-প্রতিরূপকঃ"—ইহার অর্থ এই যে, যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রীপুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র), বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে ; তাহা আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। এইরূপই বলা যাইতে পারে যে, যে ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, তাঁহার সে যে ভাব, তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, বাস্তব তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাব নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীয় ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না, ভাষা ভাবের দর্পণ-স্বরূপ। যথা—যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহার সে বাগ্‌বিদ্যা বিদ্যার প্রতিরূপ মাত্র—ভানমাত্র—বাস্তব তাহা বিদ্যা নহে। সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্যের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা না জানা বশতঃ অনেকে নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করাকেই সার জ্ঞান করেন। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য, উভয়ের মধ্যে কিরূপ অবয়ব-সাদৃশ্য, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সার্ব্বভৌমিক ভাব	সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য
(১) হিন্দু জাতীয় ভাব	(১) হিন্দু জাতি মুখ্যরূপে হিন্দু-ভাব এবং ভাষা, গৌণ-রূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা অনুশীলন করিবেক।
(২) মুসলমান জাতীয় ভাব	(২) মুসলমান-জাতি মুখ্যরূপে মুসলমান-ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা আলোচনা করিবেক।
(৩) ইংরাজ-জাতীয় ভাব	(৩) ইত্যাদি

উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে, মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন সার্ব্বভৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া দূরে থাকুক্, তাহাই আরো সার্ব্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য্য। যদি বল যে, স্বদেশীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চা করা উচিত, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, বিদেশীয় ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত করা যায়, স্বদেশীয় ভাষাতে ভাব ব্যক্ত করা যায় না; সুতরাং তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, ভাষা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করা সকল জাতীয় ধর্ম্ম নহে, উহা একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম্ম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার ভাষা অবহেলা করিয়া পরের ভাষা অনুশীলন করিলে, সার্ব্বভৌমিক ভাবের একটা ভান-মাত্রই করা হয়, একটা আড়ম্বর মাত্রই করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক সার্ব্বভৌমিক ভাবের ঠিক যাহা বিপরীত, তাহাই করা হয়। যাহারা কথা-ভক্ত এবং আড়ম্বর-ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—"দেখ দেখি

ও ব্যক্তি কেমন উদারচরিত্র, উঁহার জাতি-বিচার নাই, আপনার জাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অন্য জাতিকেও তেমনি চক্ষে দেখেন, পরের প্রতি উঁহার এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উঁহার এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পরের ভাষা শিক্ষা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহার উন্নতি সাধন পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি চমৎকার ধীশক্তি!" যাঁহারা কার্য্যভক্ত এবং অকৃত্রিম ভাবের ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ;—"উনি আপনার ভাষাই ভাল জানেন না, অন্যের ভাষা জানিতে যা'ন! তাহা হইলেও পদে থাকিত—তাহার আবার উন্নতি সাধন করিতে যা'ন! কি মূর্খতা! উঁহার কার্য্যের সম্বলমাত্র অনুকরণ, এবং কথার সম্বল মাত্র অনুবাদ, কার্য্যে বানরত্ব, কথায় শুক-পক্ষিত্ব, এই উঁহার ধীশক্তি!" যদি বল যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদেশীয় ভাষা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাষার পুষ্টিসাধন করা অতীব আবশ্যক, আমি তাহাই করিতে বলি; তবে তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে, অগ্রে যদি তুমি স্বদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হও, তবেই বিদেশীয় ভাষা দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে; অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান হইলে তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীর্ণ করিতে পারিবে। পরন্তু তুমি যদি তোমার চিরাভ্যস্ত লঘু অন্নই জীর্ণ করিতে না পার, তবে তুমি তোমার অনভ্যস্ত গুরু অন্ন কিরূপে জীর্ণ করিবে? আপন রুচির ব্যাঘাত করিয়া অন্যের রুচি অনুসারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে হয়; সেইরূপ স্বদেশীয় রুচির ব্যাঘাত করিয়া, ভিন্ন দেশীয় রুচি অনুসারে ভাষা ব্যবহার করিলে ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইহার একটি উদাহরণ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা-সম্ভবের একস্থানে আছে।

"যথা পক্ষরাজ বাজ (নির্দয় কিরাত অভিমানে লুটিলে কুলায়

তায়) শোক অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া” ইত্যাদি
বাজ পক্ষীকে পক্ষরাজ বলা এ দেশীয় রুচিসঙ্গত নহে।

এস্থলে ইগল্ পক্ষী মনে করিয়া বাজ পক্ষী বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে স্বজাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন দূরে থাকুক, তাহার বিলক্ষণ অপকর্ষ সাধন করা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব এবং স্বাধীন ভাব এখনো বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদপরায়ণ হইয়া “স্বর্গরাজ্য” প্রভৃতি ইহুদীয় শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগৌরব করা হয়।

উন্নতিশীলতা এই আর একটি কথা বালকদিগের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা কোথায় উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া কেবল উন্নতিশীলতাই শিক্ষা করিতেছে। উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক্ না কেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অর্থ ঔদ্ধত্য এবং জ্যাঠামি। প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়,তবে অনেক বিষয়—যাহা এক্ষণে উন্নতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া গৃহীত হয়—তাহা অধোগতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে;—বাঙ্গালি-সমাজের এইরূপ একটি বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা উন্নতিও বোঝেন না, শ্রেয়ও বোঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন; উন্নতিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়ম্বরসাধন। ভাষার উন্নতি সাধন কি? না শব্দাড়ম্বর! মনুষ্যের উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাড়ম্বর! যাহাতে পদার্থ আছে তাহাই এক্ষণে অপদার্থ, যাহাতে চাকচিক্য আছে, যাহাতে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই এক্ষণে সেরা পদার্থ!

যাঁহাদের বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তাঁহারা কৃত্রিম ভাবে কোন

কার্য্য করেন না, তাঁহাদের বেটি মুখ্য মনের ভাব সেইটিই তাঁহারা কার্য্যে প্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহদ্ভাব যাহাতে তাঁহাদের নিজের মন অভিভূত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট করেন, তাহাই তাঁহারা অন্যের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সকল মহৎব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা গৌণরূপে পূর্ব্বপুরুষদিগের মহদ্ভাব এবং মুখ্যরূপে সত্যের বা ধর্ম্মের বা ন্যায়ের বা মঙ্গলের মহদ্ভাব প্রচার করিয়া জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষকে উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহাদের মনে তাদৃশ মহদ্ভাব নাই, অথচ মহদ্ব্যক্তিশ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য নিতান্তই অভিলাষ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার কৃত্রিমতা অপর ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষে অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু এ কৃত্রিমতা অপর-সাধারণের মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিদ্বান ব্যক্তিদিগেরই মনশ্চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে। এরূপ যে করে তাহার কারণ এই ;—বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহা পুরাবৃত্তের সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখেন, এবং পুরাবৃত্ত অনুসারে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। অমুক দেশের অমুক প্রকারে উন্নতি সাধন হইয়াছিল, অতএব এ দেশেও সেই প্রকারে উন্নতি সাধন হইবে ; অমুক সময়ে এই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই তাঁহাদের যুক্তি। মহদ্ভাব ব্যতিরেকেও যাঁহারা মহৎব্যক্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, পুরাবৃত্তের অমুক মহৎ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিত, কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিত, তাঁহার আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল, যেমনটি দেখেন সেই প্রণালী অনুসারে চলিতে অভ্যাস করেন। পুরাবৃত্তজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মহৎ

ব্যক্তিবিশেষের আদর্শের সহিত তাঁহার কার্য্যের অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের কথার সহিত তাঁহার কথার অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মনে করেন যে, ইনি একজন তেমনিই মহদ্ব্যক্তি। এই প্রকার কৃত্রিমতা কৃতবিদ্য ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি বল "কিসে ধরা পড়ে?" এইরূপে ;— মহদ্ব্যক্তি মাত্রেই অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করেন ; সকল ব্যক্তিই সকল বিষয়ে মহৎ নহেন ; যিনি যে বিষয়ে মহৎ, তিনি সেই বিষয়ে অকৃত্রিম ভাবে চলেন। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন ; নেপোলিয়ান যুদ্ধ-কৌশলে মহৎ ছিলেন ; নিউটন বিজ্ঞানে মহৎ ছিলেন ; যে-যে বিষয়ে যিনি মহৎ, সেই সেই বিষয়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ; অর্থাৎ অন্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হ'ন নাই, আপনার মনের ভাবানুসারে চলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাঁহারা আপনার মনের ভাবানুসারে চলেন তাঁহারাই মহদ্ব্যক্তি ; বালকেরা আপনাদের মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, উন্মত্ত ব্যক্তিরাও তাহাই করিয়া থাকে। কোন একটি মহদ্ভাবে যাঁহাদের মন অভিভূত হইয়া যায়, তাঁহারা যখন আপন ভাবানুসারে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যই তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। বাল্মীকিও কবিতাতে মহৎ ছিলেন, কালিদাসও কবিতাতে মহৎ ছিলেন। বাল্মীকিও রামায়ন লিখিয়াছেন, কালিদাসও রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন। অথচ, কালিদাসের কবিতাকে বাল্মীকির কবিতার অনুকরণ বলা যাইতে পারে না। বাল্মীকি আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কালিদাসও আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম মহদ্ব্যক্তি, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ ব্যতীত এক পদও চলিতে সাহসী হন না। এই জন্য এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিলেই তাঁহাদের মনের ভাব গতি

বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশের উন্নতির প্রধানতম সোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ না করে, এ বিষয়ে আমাদের অতীব সাবধান হওয়া উচিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এক্ষণকার রাজধর্ম্ম; সাবধান, আমরা যেন তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, খ্রীষ্ট এক জন অতীব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মস্ত একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি মূসার অনুকরণ করিতেন; তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? নানক একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যদি খ্রীষ্ট বা মহম্মদের অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অকৃত্রিম মহত্ত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। আপনি না অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করা যায় না। যে ব্যক্তি লাভালাভ গণনা করিয়া, পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া, চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া ভাবোন্মত্ত হন, তাঁহার সে উন্মত্ততা নাটকাভিনয় মাত্র—তাহা সঙ্ সাজন। অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে কিছুতেই আমারদের দেশের উন্নতি হইবে না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এজন্য উন্নতির কথা উত্থাপন হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য।

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উচিত মীমাংসা করিতে হইলে, মুখ্য গৌণ বিবেচনা নিতান্তই আবশ্যক। মনুষ্যের উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে; সে-দুইটি কি? না দেব-প্রসাদ এবং আত্ম-প্রভাব।

কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার ভাবে ইহাই প্রতীতি হয়, দেব-প্রসাদই মুখ্য, আত্ম-প্রভাব গৌণ। নিউটনের প্রসিদ্ধ খেদোক্তি ("আমি কেবল সমুদ্রের ধারে কতকগুলি লোষ্ট্র কুড়াইতেছি") কাহারো অবিদিত নাই। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এরূপ

আত্মশ্লাঘব এবং দেব-মহিমা কীর্ত্তন আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। এমন কি খ্রীষ্টও বলিয়াছেন যে "আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল পরমেশ্বর।" যাঁহারা কোন একটা মহদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই ভাবেরই প্রাধান্য মুখ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার প্রাধান্য গৌণরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যেমন কোনো রাজার অনুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, সেইরূপ অপৌরুষেয় ভাববিশেষের গৌরবেই মহদ্ব্যক্তি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, মুখ্যরূপ আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ব্যক্তি-মাহাত্ম্য যেমন বোঝেন, ভাব-মাহাত্ম্য তেমন বোঝেন না। ইহাতে সমাজের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ভাব-মাহাত্ম্যের প্রতি উপেক্ষা এবং ব্যক্তি-মাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে আমাদের দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। মহত্ত্ব, উপার্জ্জন করিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে—মহদ্ভাবে কার্য্য করিতে হইবে—ইহা এক্ষণে আর নাই, এক্ষণে কেবল মহদ্ব্যক্তি হইতে পারিলেই হইল। এক্ষণে মহদ্ভাবের কার্য্য নাই—মহদ্ভাবের শিক্ষা নাই—অথচ মহদ্ব্যক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিব, নীচ পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে পুরুষানুক্রমে নীচত্ব প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিব—অথচ মহদ্ব্যক্তি হইব! এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে—এই যাহা দেবতাদেরও অসাধ্য—সেই মৃগতৃষ্ণিকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার বাস্তবিক মহত্ত্বে জলাঞ্জলি দিলে তবেই "আমি একজন মহদ্ব্যক্তি" উপাধিটি বৃথায়াস-পরায়ণ দুরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ললাটদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! এক্ষণে যেমন উকিল চিকিৎসক এবং সংবাদপত্র দিন দিন সুলভ হইতেছে, সেইরূপ

মহদ্ব্যক্তিও সুলভ হইতেছে! কিন্তু এটাও দেখিতেছি যে, উকিলের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য বিবাদ-কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদপত্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইতেছে, মহদ্ব্যক্তির সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ আচার-ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধি-পরম্পরাকে শ্রীবৃদ্ধি উপাধি না দিলে আজিকার কালের রীতি-বহির্ভূত আচরণ করা হয়! অদ্যকার কালে উপাধিই সার—আর সকলই অসার! সুতরাং উপাধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে আধুনিক "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" হেলন করা হয়। কেবল যে কার্য্য আড়ম্বর-শূন্য, তাহাই "উনবিংশতি শতাব্দীর" :উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়। বালকদিগকে রাজা উপাধি দিয়া নৃত্য করাইলে, তাহারা যেমন ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আপনাদিগকে রাজা মনে করে, সেইরূপ আধুনিক মহদ্ব্যক্তিগণ কেবল উপাধিটি পাইলেই আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে আবার উপাধি লাভের এমনি সুবিধা হইয়াছে যে, যত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যত তুমি দেশের বাস্তবিক উন্নতির প্রতি খড়্গ-হস্ত হইবে, ততই তোমার মস্তকে উচ্চ প্রদেশ হইতে উপাধি-পুষ্প বর্ষিত হইবে। সেদিনকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি নাটকের একটি কিম্ভূতকিমাকার অনুবাদ আমাদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে দলিত করিয়া পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? যেখানে বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে! দেশীয় রুচি-বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করিলে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, সেইরূপ আবার দেশীয় রীতি-বহির্ভূত আচরণ করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমাদের দেশীয় রীতি এই যে, যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারা

আড়ম্বর-শূন্য, বিচক্ষণ, অচঞ্চল-স্বভাব, জ্ঞান-পরায়ণ, নম্র, ভক্তিমান, ঋজু, সত্য-পরায়ণ, অকৃত্রিম হইবেন। কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদ্‌গুণ অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে।—আড়ম্বরশূন্য? তবে ত নিষ্কর্ম্মা! বিচক্ষণ? তবে ত কুটিল-বুদ্ধি! অচঞ্চল-স্বভাব? তবে ত স্থাবর! জ্ঞান-পরায়ণ? তবে ত শুষ্ক তার্কিক! নম্র?—তবে ত কাপুরুষ! ভক্তিমান্? তবে ত ভ্রান্ত! ঋজু? তবে ত কাজের বাহির! সত্য-পরায়ণ? সন্দেহ-স্থল! সত্য যে একটা আছে এ বিষয়ে এক্ষণকার লোকের মনে বাস্তবিক সন্দেহ জন্মিয়াছে। মুখে সত্যের জয়-ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু মিথ্যা দ্বারা কাজ আদায় করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আন্তরিক কথা। সত্যের যে বাস্তবিক বল আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অতি অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বর-কারিতা, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্যতা, প্রতি-ধ্বনি-পটুতা, পাকচক্রিতা, জ্ঞানদ্বেষিতা, প্রগল্‌ভতা উপাধি-লুব্ধতা, এই সকল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগ্য হইতে পারে না। এই জন্য ঐ সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভাজন হইতেছে। দেশের লোকের এই যে-সকল অনিষ্ট, ইহার মূল কেবল ব্যক্তি-গৌরব এবং ভাবলাঘব। যাঁহাদের লঘু ভাব, তাঁহারা গুরু ব্যক্তি হইতে চান; এবং এক্ষণকার সমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাঁহারা মনে করিলেই গুরু ব্যক্তি হইতে পারেন। উপর-ওয়ালাদের নিকটে কোনো প্রকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেই কল্য যে ব্যক্তি কিছুই ছিল না, অদ্য সে ব্যক্তি একজন মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে! এই সকল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির কার্য্য এই যে, আমাদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে যাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ইহারি কেবল চেষ্টা; তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, এবং তাহার ফল যে তাঁহাদিগকেই অধিক পরিমাণে ভুগিতে

হইবে, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। শক্তিগর্ব্বিত উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃহৎ একটি ফল-লাভের প্রত্যাশায় প্রথমে তাঁহারা সমাজের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হন, অথচ এইরূপ ভান করেন যেন তাঁহারা নিতান্তই ফল-কামনা-শূন্য—সত্যই যেন তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন! ইঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা কাটিতেছেন। ইঁহাদের ভরসা একমাত্র এই যে, অধিষ্ঠান-শাখা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি উচ্চ প্রদেশীয় একটি শাখা পাকড়িয়া ধরিবেন। ইঁহাদের জানা উচিত যে, আপনার বাসগৃহ ভাঙিয়া অন্যের বাসগৃহে যে ব্যক্তি স্থান যাচ্ঞা করে, আর, স্বদেশীয় সমাজ ভাঙিয়া যে ব্যক্তি বিদেশীয় সমাজের আশ্রয় যাচ্ঞা করে, উভয়েই তুল্য নির্ব্বোধ। অন্যেরা তোমাকে তাহাদের গৃহে স্থান দিবে কেন? এবং তুমিই বা এমন অন্যায় প্রার্থনা করিবে কেন? ইহা না বুঝিয়া, এক্ষণকার নব্য অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের যুক্তি এইরূপ—"আমরা তোমাদেরই অনুকরণ করিতেছি, তোমাদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমাদেরই ভাষা ব্যবহার করিতেছি, যেরূপ বলাও সেইরূপ বলি, যেরূপে চালাও সেইরূপ চলি, অথচ তোমারা আমাদিগকে আদর কর না, ইহাতে বোধ হয় যে, তোমরা আমাদের দেশীয় লোকের ভাল দেখিতে পার না।" এক ত—অন্তঃসারশূন্য পরানুকারী ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া নাচিতে হইবে—ইহা কোনো শাস্ত্রেই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয়া মান ভিক্ষা করা এবং কাঁদিয়া সোহাগ ভিক্ষা করা যে, কিরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার তাহা বলতব্য কহতব্য নহে; এমতাবস্থায় আমরা আপনারা আপনাদের ঐ প্রকার নীচ আচরণে কোথায় লজ্জিত হইব—তাহা গেল অধঃপাতে—উল্টা আরো তজ্জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করিতে লেশমাত্রও লজ্জা বোধ করি না! জানা উচিত যে, যেমন একটা দুর্দমনীয় মর্কট বানর'কে আদর না দেওয়াই সুবুদ্ধির

কার্য্য এবং তাহাকে আদর দেওয়া কুবুদ্ধির কার্য্য, সেইরূপ ধামা-ধরা ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত কার্য্য ; তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত কার্য্য। "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এই একটি কথা অনুকারক-সম্প্রদায়ের স্পর্শমণি স্বরূপ। শত শত কুৎসিত আচরণ কর—দেশের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ কর—স্ত্রীগণকে নিলর্জ্জতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেও, পূর্ব্ব পুরুষদিগের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া—নানা প্রকার কিম্ভূত কিমাকার উপাধির ভারে নত-মস্তক হইয়া—শক্তের ভক্ত এবং দুর্ব্বলের যম হও, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এই বীজমন্ত্রটিকে উচ্চারণ করিতে ছাড়িও না ! ঐ শব্দটি ধ্বনিত হইলেই অতি যে হেয় সামগ্রী তাহা উপাদেয় হইবে—অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা প্রশংসনীয় হইবে—অতি যে মর্ম্মভেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে—অতি যে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার তাহা যৎপরোনাস্তি ভদ্র হইবে।

সভ্যতার কথা-উত্থাপন হইলেই বসন-ভূষণের পরিপাট্য প্রভৃতিকে অনেকে মুখ্য পদে বরণ করিয়া থাকেন ; সভ্যতার বহিরঙ্গকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন, তদ্ভিন্ন সদ্ভাব সদাচার বিনয় নম্রতা ভ্রাতৃভাব কৃতজ্ঞতা দেশহিতৈষিতা আতিথি-জনের প্রতি যথাযোগ্য সমাদর, কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্ন, ঔদার্য্য ক্ষমা আর্জ্জব তিতিক্ষা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা ইত্যাদি সভ্যতার যে গুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি আদর অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা, এই এক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকেরা স্বজাতীয় উচ্চতর সভ্যতার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। "ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা" পূর্ব্বে এই মাত্র শুনা যাইত ; এখন আমাদের দেশের সভ্যতার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে যে, "ইংরাজি গৃহই গৃহ, বাঙ্গালীদের গৃহ নাই" এই এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন কথার আন্দোলন কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে !

"বাঙ্গালিদের গৃহ নাই" ইহার অর্থ এই যে, প্রকৃত গার্হস্থ্য ভাব যে কি তাহা বাঙ্গালিরা জানে না! কি হাস্য-জনক কথা!—অথচ ঐ কথা, ধীর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইয়া থাকে; কেহ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ বর্ষণ পূর্ব্বক ঐ অসার অপদার্থ বচনটাকে স্বর্গে তোলেন। যে হিন্দুরা পিতা-মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে, বালক-শূন্য গৃহকে শ্মশান-সমান বলে, যে হিন্দুরা ভদ্রাসন-বাটী হস্তান্তর করিতে হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে, যে হিন্দুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিয়া ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা গার্হস্থ্য-রসে বঞ্চিত! কী সে, না জানি, অপূর্ব্ব সভ্যতা যাহার সংস্পর্শে গৃহ অগৃহ হয়, পিতা অপিতা হয়, ভ্রাতা অভ্রাতা হয়!—এরূপ হৃদয়-শূন্য জীবন-শূন্য কাষ্ঠ-সভ্যতা যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারা হিম-প্রধান দেশের তুষাররাশির মধ্যে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের সভ্যতানুরাগ চরিতার্থ করুন। আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই প্রাচীন পুণ্যভূমিতে, সেই সভ্যতাই জন্ম জন্ম বিরাজ করুক, যে সভ্যতা জননী এবং জন্ম-ভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করে।

"অপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই", এ বাক্য যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কী না করিতে পারে? আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি হয় কাহার? মাতা পিতার প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ দ্বেষ হিংসাদি কালসর্পের আবাসস্থান, প্রীতি-ভক্তির যেখানে নাম-গন্ধ নাই, এমনি মরুভূমি-তুল্য যাহার হৃদয়, তাঁহাদেরই মতো কাষ্ঠপাষাণে গড়া ব্যক্তিদিগেরই তাহা অঙ্গের ভূষণ। গৃহ-কুটীর হইলেও কী তাহা রাজ-অট্টালিকা নহে? গৃহের ন্যায় পবিত্র সামগ্রীকে যাঁহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে

যান তাঁহাদের রুচিকে ধন্য! অন্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গৃহের প্রতি যাঁহাদের অভক্তি জন্মে, তাঁহাদের হৃদয়কে ধন্য!! এবং আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যাঁহারা পরের নিকটে শিক্ষা করিতে যান তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্য * !!!

হৃদয়ের যে সভ্যতা তাহাই মুখ্য সভ্যতা—আর আর যত প্রকার সভ্যতা সবই গৌণ সভ্যতা। গৃহ ইংরাজি-রীতি অনুসারে সজ্জিত না হইলে কি তাহা গৃহ হয় না? সভ্যতা ইংরাজি-রুচি-সম্মত না হইলে কি তাহা সভ্যতা হয় না? হিন্দু জাতির রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে যেমন একটি অকৃত্রিম সহজ-শোভন ভাব প্রকাশ পায়, তেমন আর কোথায়? মুখ্য সভ্যতা তাহাকেই বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, তদ্ভিন্ন আর যত প্রকার সভ্যতা সমস্তই বাজে সভ্যতা। দেশীয় প্রথানুসারে নমস্কার

---

* কোনো একটি আমেরিকান্ মিসনরি-স্কুলের বালকের সহিত তত্রত্য সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। বালক আপনিই লেখকের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়াছে।

সাহেব। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা বড় নিষ্কর্ম্মা—আমাদের স্ত্রীলোকেরা দেখ দেখি কেমন কর্ম্মঠ।

বালক। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ত সর্ব্বদাই কাজ করে—রন্ধন করে, অতিথি-সেবা করে, গৃহকার্য্য সমস্তই ত তাহারা করে।

সাহেব। ও সকল কাজ আমরা কাজের মধ্যেই ধরি না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা নেবু হইতে রস বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশে লবণ সংযোগ করিয়া একরূপ আচার প্রস্তুত করে—তাহা তোমাদের স্ত্রীলোকেরা পারে?

বালক। না তাহা পারে না।

সাহেব। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি তাহা শিখিতে ইচ্ছা করে তবে আমি তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি।

সাহেবের এই কথা শুনিয়া বালকের মনে অবশ্য ইহা ধ্রুবজ্ঞান হইল যে, বাস্তবিক

বা প্রণাম করাতে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে শুদ্ধ কেবল মস্তক নত করিলে তাহার অর্দ্ধাংশও না। দেশীয় প্রথানুসারে সাদরে আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে যেমন প্রীতি এবং সদ্ভাব প্রকাশ হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে চটুলভাবে হস্তালোড়ন করিয়া হাউ-ডু-ইয়ু-ডু বলিলে তেমন কথনই হয় না। ইংরাজেরা বলেন যে "থ্যাঙ্ক্", এই শব্দ যেমন কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক, আমাদের দেশে সেরূপ কোন শব্দ প্রচলিত নাই; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জাতি বড়ই অকৃতজ্ঞ জাতি। "থ্যাঙ্ক্" শব্দের মূল-ধাতু "থিঙ্ক্" শব্দ; "থ্যাঙ্ক্" শব্দের অর্থ এই তুমি আমার মনে রহিলে; অথবা তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা আমার মনে রহিল। "কৃতজ্ঞ" এ শব্দেরও অর্থ ঐরূপ। আমাদের দেশে উপকৃত ব্যক্তি কোন স্থলে নমস্কার করে, কোন স্থলে জয়ী হও, সুখে থাক, চিরজীবী হও, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন,—এইরূপ শব্দ সকল ব্যবহার করে। মৌখিক একটা কথা ঝটিতি উচ্চারণ করিয়া, দ্রুতগতি ঋণমুক্ত হইবার প্রথা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জাতি মৌখিক কৃতজ্ঞ নহে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। দ্রুতগতি দুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে মৌখিকরূপে আপ্যায়িত করাকে

অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বড়ই নিষ্কর্ম্মা! কেন? না যেহেতু তাহারা উক্তরূপ আচার প্রস্তুত করিতে জানে না! কি চমৎকার যুক্তি! দেশীয় প্রথানুসারে যে যত কার্য্য করুক, তাহা কার্য্যই নহে। রাশি রাশি উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করুক, সাহেবের তাহা মনে ধরে না। সাহেবি রুচি-অনুসারে যৎসামান্য নেবুর আচার প্রস্তুত করিলেই আমাদের স্ত্রীলোকেরা ধন্য ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইবে। বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষালাভ হইতে থাকিলে বঙ্গদেশ অচিরেই এক অপূর্ব্ব "স্বর্গরাজ্যে" পরিণত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। নিতান্ত বালকের মনে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা শোভা পায়, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ঘরের [illegible] পরের বুদ্ধি শুনিয়া আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করেন, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়।

যদি সভ্যতা বল, তবেই যাহা হউক, নচেৎ আমাদের দেশের সভ্যতা উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সংশয় নাই। যন্ত্রাদি বিষয়ে ইংরাজদিগের অশেষ পারদর্শিতা আছে, ইহা মানিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের সহজ-শোভন পরিধান-বস্ত্রের তুলনায় পাশ্চাত্য প্রদেশের পরিধান বস্ত্র যে, এক প্রকার কাষ্ঠ পুত্তলিকার গায়ের সাজ, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমাদের দেশের সভ্যতা হৃদয়-প্রধান, ইংরাজদিগের সভ্যতা কারিকরী-প্রধান। ইহার মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য কোন্‌টি গৌণ, সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান ; পরন্তু কাষ্ঠ-পাষাণদিগকে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও তাহারা তাহা দেখিতে পায়ও না—দেখিতে পাইবেও না।

কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক

যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিতেছি সে দুয়ের মধ্যে যেমন ভাব-বৈষম্য, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। একজন সত্য বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া যান, ইনি বাস্তবিক ভাবের লোক; আর একজন সত্যের আন্দোলন করিয়া থাকেন মঙ্গলেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাকে ভোলেন না;—ইনি কাল্পনিক ভাবের লোক। আপনাকে ভোলা না ভোলা কাহাকে বলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়;—তবে তার্কিক ব্যক্তিগণ তাহা না বুঝিতে পারেন, সুতরাং ইঁহাদের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। "আপনাকে ভোলা" ইহার অর্থ এই যে, সত্য মঙ্গল প্রভৃতি মহদ্ভাব-সকল সমুদায় জগতের সাধারণ সম্পত্তি—একটি বালুকাকণাতেও সত্য আছে, মঙ্গল আছে। তাহা যখন সমুদয় জগতের সাধারণ সম্পত্তি—তখন তাহা আমাদের আপনা আপনা অপেক্ষা ব্যাপক ইহা তো ধরা কথা। অর্থাৎ আমরা প্রতি-জনে সত্য এবং মঙ্গলের অন্তর্গত, সত্য এবং মঙ্গল আমাদের অন্তর্গত নহে; শাখা বৃক্ষের অন্তর্গত বই বৃক্ষ শাখার অন্তর্গত নহে। সত্যের অভ্যন্তরে যখন আমরা প্রতি জনে বাস করিতেছি তখন সত্যকে পাইয়া আপনাকে ভুলিতে কোন হানি নাই। একটা কৌটার ভিতর নানাবিধ রত্ন রহিয়াছে পুঁজি করা, এমতাবস্থায় সেই কৌটাটি পাইয়া কি কি রত্ন তাহার

১২৮৫ সালের ভারতীর ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত।

মধ্যে আছে তাহা ভুলিলামই বা তাহাতে হানি কি? কিন্তু তাহাতে যদি তাহার মধ্যকার কোন একটি বিশেষ রত্নের প্রতি আমাদের এত লোভ হয় যে সেইটির কুহকে পড়িয়া অন্যগুলিকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেই ক্ষতির সম্ভাবনা। আমরা প্রতি জনই যখন সত্যের অন্তর্গত তখন সত্যকে পাইলে আপনাকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, এজন্য শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সত্যের অনুশীলন করিতে আপনার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করেন না, তিনি জানিতেছেন আমি সত্যের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি—সত্যকে পাইলে আমি সত্যের মধ্যে আপনাকে না পাইব এমন নয়—আমি আপনাকে শূন্যে বিসর্জ্জন দিতেছি না—তবে আর চিন্তা কি? আপনার বিষয়ে যিনি এইরূপ নিশ্চিন্ত, তিনি সর্ব্বান্তকরণে সত্যের অনুশীলন করেন, মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন—সত্য এবং মঙ্গলের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন—ইহাকেই বলে সত্যের অনুশীলন এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আপনাকে ভোলা। কাল্পনিক ভাবের ব্যক্তিরা সত্যেরই অনুশীলন করুন আর মঙ্গলেরই অনুষ্ঠান করুন, তাঁহাদের কার্য্যগুলির মধ্যে বিষবীজ একটি যে মাটি-চাপা থাকে তাহাই সর্ব্বনাশের মূল। আপাতত তাহা এমনি সূক্ষ্ম যে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—নাই বলিলেই হয়; কিন্তু কালে তাহা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠে; সে বিষবীজটা কী? না স্বার্থ।

কাল্পনিক ব্যক্তিরা লক্ষণে ধরা পড়েন। প্রথম লক্ষণ—তাঁহাদের কথাগুলি এমনি ধরণের যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় যত পাও আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই পাইবে। যাঁহারা বাস্তবিক ভাবের লোক তাঁহারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই কার্য্যটি বুঝিয়া তাহার নামটিও সেইরূপ দিয়া থাকেন। কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল প্রমাণ কার্য্যের তাল প্রমাণ নাম দিতে না পারিলে কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয় লক্ষণ—দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা-বর্জ্জিত অসঙ্গত অনুকরণ। সত্য এবং মঙ্গলের এমনি একটি বল আছে যে, তাহা শ্রদ্ধাবান মনুষ্যকে অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে. ঠিক যেটি চাই সেইটির মতন করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু সত্য এবং মঙ্গল যাঁহাদের মনে নয়—মুখেই কেবল, অনুকরণ ভিন্ন তাঁহাদের আর গতি নাই। অমুক দেশে অমুক লোক অমুক কার্য্য করিয়া লোকের মহোপকার সাধন করিয়াছে, অতএব আমিও অবিকল সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; এইরূপ ভাবিয়া যদি পরের আঁচল ধরিয়া চল—তবে অনভিজ্ঞ লোকে তোমাকে দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি মনে করিবে; যদি নিরপেক্ষ সত্য এবং মঙ্গলের হস্ত ধারণ করিয়া চল তাহা হইলে লোকে তোমার মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারিবে না, কিন্তু ইহাতে একটা কাজ হইবে, উহাতে কেবল আড়ম্বরই সার। বাস্তবিক-ভাবের লোক কী প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি;—মনে কর, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে যে, তিনি দেশীয় চাষা লোকদিগের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিবেন। প্রথমে চাষাদিগের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতেই হয়ত তাহার দুই বৎসর কাটিয়া যাইবে। চাষাদের মধ্যে ভাল মন্দ আছে; ভাল চাষাদিগের চাষ-পদ্ধতি কিরূপ তাহা শিক্ষা করিতে হয়ত তাঁহার আর তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। তাহার পর ভাল কৃষিকার্য্য শিক্ষা যাহাতে সাধারণে প্রচলিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগ করিতে আর দুই বৎসর যাইবে। তাহার পর তাঁহার উদ্যোগ সফল হইতে হয়ত এক বৎসর লাগিবে। এইরূপ অনেক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি যদি আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতি সাধারণে চালাইতে পারেন, তবে আপনার পরম সৌভাগ্য মনে করেন। তাহার পর তাহা অপেক্ষা কৃষি-কার্য্যের আরো উন্নতি সাধনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে শোভা পায়। তাহা তাঁহার অভিপ্রায় হইলে তিনি বিদেশীয় কৃষি-প্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষা করেন; স্বদেশীয় কৃষি-কার্য্যের কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ

এদেশের পক্ষে বিদেশীয় কৃষি-কার্য্যেরই বা কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা তিনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন। এ দেশীয় কৃষিকার্য্যের যাহা ভাল তাহা তিনি নড়াইতে চা'ন না ; বিদেশীয় কৃষি-প্রণালীর ভাল অংশ এদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না হইলে তবেই তাহা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা পা'ন। তিনি জানেন, পত্তন ভূমিটি স্বদেশীয় হওয়া চাই। ব্যঞ্জন নয় বিদেশী হউক, অন্নটি স্বদেশী হওয়া চাই। তুমি সহস্র কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আমাদের দেশীয় মূল কৃষিপ্রণালীর উপর বিদ্যা চালাইতে গিয়াছ কি অমনি ঠকিয়াছ। আমাদের দেশের প্রকৃতি স্বয়ং যাহা চাষাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উপর কাহারো বিদ্যা খাটে না। বাস্তবিক-ভাবের ব্যক্তি আপনার দেশীয় প্রকৃতির পত্তন-ভূমির উপর বিদেশীয় উচ্চ অঙ্গের নীতিগুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা পা'ন, তা' ভিন্ন বিদেশীয় বেশভূষা বা কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্য তাঁহার একবার মনেও আইসে না— তাঁহার মন আসলের দিকে, নকলের দিকে নহে, বাস্তবিক ভাবের দিকে, কাল্পনিক ভাবের দিকে নহে।

কাল্পনিক ভাবের তৃতীয় লক্ষণ নাম-পরায়ণতা অর্থাৎ কার্য্য অপেক্ষা নামের প্রতি অধিক দৃষ্টি। তাই কাল্পনিক ভাবের লোক উপরি-উক্ত ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেব গড়িতে গিয়া নিশ্চয়ই বানর গড়িয়া ফেলেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের কৃষিকার্য্য কিরূপ প্রণালীতে চলে তাহা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শিক্ষা করেন সে দিকে তাঁহার মন যাইবে না, কার্য্যার্থে বৎসর বৎসর পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ লোকে তাঁহার কার্য্যের কিছুই দেখিতেছে না, জানিতেছে না ; এ অবস্থা তাঁহার পক্ষে কঠোর কারাবাস-তুল্য। তাঁহার দুইটি জপমালা—মুখে একটি, মনে একটি ; মুখের জপমালা এই, কৃষকদিগের কিসে ভাল হয় ; মনের জপমালা এই, লোক আমাকে কিসে জানে। সুতরাং একটু রহিয়া বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করাকে

তিনি বৃথা সময় নষ্ট মনে করেন। কেননা ততক্ষণ তিনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিতে পারেন। কাজ কত দিনে হয়, তাহার ঠিকানা নাই—আদবেই হয় কি না, তাহাও সন্দেহ কিন্তু তাহা বলিয়া হাঁকডাক কেন থামিয়া থাকে, এইরূপ ভাবিয়া একেবারেই তিনি হয়ত বিদেশীয় কৃষি-প্রথা এদেশে প্রচলিত করণার্থে ইংলণ্ড গমনে কৃতসংকল্প হ'ন। তিনি অমুক দেশে গিয়াছেন, অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, যখন যাহা করিতেছেন সকলি সংবাদপত্রে টাটকা-টাটকি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তারপর দেশে ফিরিয়া আইলেন, লোকের আশাচক্ষু তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, কবে বৈলাতিক "স্বর্গরাজ্য" এদেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিবে। তাঁহার ভাবী মহাপকারী কার্য্যকলাপ উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রীয় নানা মুনির নানা ভবিষ্যৎ বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাহার কার্য্যাভিসন্ধির ছিটা-ফোঁটা ইঙ্গিত-আভাস সাদরে গৃহীত হইয়া ফেনিত প্রতিফেনিত হইতেছে। এইরূপ শব্দাশব্দি ও ফেনাফেনি ব্যাপার যত উচ্চে উঠিবার তাহা উঠিয়া ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া আসিতে লাগিল। সংবাদপত্রের উৎসাহ আনন্দ অল্প অল্প করিয়া বিলাপে পরিণত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জার অনুরোধে তখন আর তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিতান্ত মৌন থাকাটাও ভাল দেখায় না, সুতরাং এখন এক যাহা বলিবার আছে তাহাই তাঁহারা বলেন ও অপেক্ষা করেন তাহা এই যে, অমন যে একজন উপযুক্ত লোক ও ব্যক্তি শুদ্ধ কেবল বাঙ্গালীদের দোষে কোন কাজই করিতে পারিল না, একজনও ওকে সাহায্য দিবে না, একা ও ব্যক্তি কি করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা আপনার কাজের গুণে লোকের নিকট হইতে সাহায্য আকর্ষণ করেন, অন্যেরা যদি তাহা না পারে সে তাহাদেরই

দোষ. সে দোষ গরিব বাঙ্গালী জাতির ঘাড়ে চাপাইলে কি হইবে? শূন্য-গর্ভ আড়ম্বরী ব্যক্তিকে কেহ না চেনে এমন নয়;—কাজের লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক দিয়া বসিয়া আছে যে, এ ব্যক্তির দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না; ভাবের লোকেরা ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিয়াছে যে যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না; কেবল গল্পের লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের প্রত্যাশা করেন; এমন কি ভবিষ্যতে যাহা তিনি করিবেন, বর্ত্তমানেই তাঁহা কর্ত্তৃক তাহার অর্দ্ধেকের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পা'ন।

কাল্পনিক ব্যক্তিদিগের নিকট অনুকরণই সকল রোগের মহৌষধি, সকল উন্নতির মূল, সকল অপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা অনুকরণের পথ অবলম্বন করিলে বড় লোকের দোহাই দিয়া অনায়াসে বড় হওয়া যায়—সেক্সপিয়ারের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী নাটক লিখিলে বাঙ্গালী সেক্সপিয়ার হওয়া যায়। মিল্‌টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী মহাকাব্য লিখিলে বাঙ্গালী মিল্‌টন হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার সহজ উপায় যেমন অনুকরণ এমন আর কিছুই নহে। অনুকরণ-পন্থীদিগের স্বপক্ষে এই কেবল এক বলিবার আছে যে, সকল দেশের লোকই বস্তু-পক্ষে সমান; একথা যথার্থ কথা; কেননা সকল মনুষ্যই মনুষ্য। কিন্তু তা' বলিয়া মনুষ্যের মধ্যে বাস্তবিক যে একটা জাতিভেদ আছে, কাজের সময় তাহা ভুলিবে তুমি কেমন করিয়া? জল এবং বায়ু উভয়েই সমান, কেননা উভয়েই ভৌতিক বস্তু; কিন্তু তা' বলিয়া কি জলপানের পরিবর্ত্তে বায়ুপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারো? যে দেশের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সে দেশের কার্য্য যদি সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের দেশে ওক গাছ এবং বিলাতে আম্র কাঁঠাল গাছ সুবর্দ্ধিত হইতেও পারিত। আমাদের দেশে যদি প্রকৃতির কল বিগ্‌ড়াই যাওয়া গতিকে কখনও ওক গাছ জন্মে তবে সে তেমনি ওক গাছ—যেমন সেক্সপিয়রের

বাঙ্গলা অনুবাদ সেক্সপিয়ার! তেমনি আবার বিলাতে যদি আম্র গাছ জন্মে তবে সে তেমনি আম্র গাছ—যেমন শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ শকুন্তলা। কল্পনিক ভাবের লোক অন্যের চক্ষে ধূলি দিতে গিয়া আপনার চক্ষে আপনি ধূলি প্রদান করিয়া থাকেন; এই তাঁহার প্রধান শাস্তি। তিনি আপনাকে বাহিরে যেমন জানান, ক্রমে ক্রমে আপনাকে সেইরূপ ঠাহরান। পূর্ব্বে তিনি নাম চাহিতেন, কাজ চাহিতেন না; এক্ষণে তিনি নাম যথেষ্ঠ পাইয়াছেন—নামের অনুরূপ কাজ করিতে চাহেন। কিন্তু নামের জন্য কাজ করাই তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, কাজের জন্য কাজ করা তাঁহার অনভ্যস্ত। যদিও তাঁহার এক্ষণে যথার্থই কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না; নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়; কেননা এযাবৎ কাল তিনি ক্রমাগতই নাম সাধনার্থেই নানা প্রকার কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে কাজের সে উত্তেজকটি নাই, নাম যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে তাহা আর কাজকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহার কাজ বন্ধ হইয়া এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

বঙ্গালী জাতি এক্ষণে কাল্পনিকতা-পথের বিষম একটি সঙ্কট-স্থানে পৌঁছিয়াছে; সে পথে যত অগ্রসর হইবে, ততই ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহাকে পশ্চাদ্‌গমন করিতে হইবে। তাই বলি—এ পথ হইতে যত শীঘ্র পশ্চাদ্‌গমন করা যায় ততই ভাল। বাস্তবিক ছাড়িয়া কাল্পনিক, আসল ছাড়িয়া নকল, এই দিকে এখন বাঙ্গালি জাতির এমনি একটা প্রবল টান পড়িয়াছে যে তাহাকে সামলানো ভার। বাঙ্গালী জাতি দেখিয়া শিখিবার জাতি নহে, না ঠেকিলে তাহার শিক্ষা হইবে না কিছুতেই! এ একটি সামান্য বিপদ নহে। এই বিষয়টিতে বাঙ্গালী জাতির যদি একটু চৈতন্য হয়, তাহা হইলে এজাতি অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে

পারে, কিন্তু তাহা হয় কই ? তাহা যে-দিন হইবে সেদিন বাঙ্গালীর স্কন্ধ হইতে বৃহৎ একটা বোঝা নামিয়া যাইবে—তাহার শরীর মন লঘু হইবে—প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে আসিয়া স্নিগ্ধ হইয়া বাঁচিবে। তখন বুঝিবে, দেশ-কালপাত্র-বিবেচনাশূন্য অনুকরণের আর-এক নাম হনুকরণ।

সোণার কাটি রূপার কাটি

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অন্ত এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীত কালের রাত্রে হিহি করিয়া লেপ মুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্ষা-রাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক নিভৃত কোনে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুর্‌ফুরে সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত ফিন্‌ফিনে উড়ানীর সথা-বেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক ছাতে মাদুরের উপরে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট বা অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষকারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা-দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া, সোণার কাটি রূপার কাটির গল্পের মাঝে মাঝে হুঁ না-দিয়াছেন, কিম্বা সেই উপন্যাসের পৃষ্ঠে "তা'র পর তা'র পর" শব্দের চাবুক কখনো বা মৃদু-ভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন!

সাহসে ভর করিয়া তো অতগুলা কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তবুও আমার মনোমধ্যে নানা প্রকার কিন্তু হইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দী যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে ইংরাজী সভ্যতার লোহবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছে (ধন্য বলি তোমাদের দুই ভাইকে—বাষ্পীয় জলযান এবং স্থলজান!) তাহাতে এত দিনে বোধ করি রাক্ষসদিগের "হাঁউ মাঁউ খাঁউ" গর্জ্জন-ধ্বনি জম্বুদ্বীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে (ইংলণ্ডে) চম্পট প্রদান পূর্ব্বক "ভারতবর্ষের ছেলে-ভুলানো উপকথা" নামক কোন একটি ইংরাজি পুস্তকের পরিশিষ্ট মহলের নোট্ x, y, বা z-কোটার অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতেছেন।

বহুবাজারে সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১২৯১ সালের ২৭শে মাঘের অধিবেশনে পঠিত।

এবং দৈবযোগে তাহা আমাদের দেশের কোনো কুমারী লীলাবতী (সংক্ষেপে Lilly) তর্কালঙ্কার M. A'র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে তিনি ঈষৎ মুখ মুচ্‌কিয়া তাঁহার সহাধ্যায়িনীকে বলিতেছেন, "প্রিয় সখি! এই বইখানি প'ড়ে আমি অবাক হ'য়েছি! আমাদের দেশের আগেকার লোকেরা রাক্ষস বিশ্বাস ক'র্‌তো! ছেলেবেলা-থেকে মা'য়ের দুধের সঙ্গে কুসংস্কার গিলে গিলে না জানি বড় হ'লে তারা কি ভয়ানক অদ্ভুত জানোয়ার হ'য়ে দাঁড়া'ত! আমার এই বিশ্বাস যে, এখনো যদি আমরা আমাদের এক-রত্তি হাড় মেডিকেল্‌ কালেজে পরীক্ষার জন্য পাঠাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার মধ্য হইতে অর্দ্ধেকের বেশী কুসংস্কারের গাদ বাহির হইয়া পড়িবে! তাই বলি, প্রিয়সখি! আমি আমার নক্ষত্রকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি ইংরাজি ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি!" কুমারী Lilly তর্কালঙ্কার M. A. বিদুষী বটেন—কিন্তু তিনি জানেন না যে, ইংরাজি শিশু-ভুলানিয়া উপন্যাস-মুলুকেও রাক্ষসের অভাব নাই। তা' ছাড়া, ইঙ্গল্যাণ্ড এবং বঙ্গল্যাণ্ডের রাক্ষসীদের হাঁকডাকের মধ্যে খাপে খাপে মিল রহিয়াছে এম্নি চমৎকার যে, তাহা তাঁহার শিক্ষাদাত্রী ইংরাজ-কুমারীদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। তার সাক্ষী :—

বাঙ্গালী রাক্ষসীর হাঁকডাক	ইংরাজ রাক্ষসের হাঁকডাক
হাঁউ মাউ খাঁউ! মানুষের গন্ধ পাঁউ!	Fi! Fo! Fum! I smell the blood of an Englishman.

যেরূপ এখন সুসভ্য প্রণালীতে আমাদের বালকদিগের কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার সমস্ত গাঁথনি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বালকের পিতা যখন বালককে কোনো খাদ্য সামগ্রী দে'ন

তখন পাঠশালার বালক বলে "ধন্যবাদ বাবা"—ইস্কুলের বালক বলে "Thank you বাবা ;" বালক যখন যুবা হইবেন, তখন পিতাকে বলিবেন "Governor;" যুবা যখন প্রৌঢ় হইবেন—যখন হ্যাটকোটের তা' লাগিয়া লাগিয়া তাঁহার হাড় পাকিয়া উঠিবে—তখন পিতাকে বলিবেন "Old fool" বুড়া মূর্খ,—এইরূপ করিয়া যখন আমাদের দেশের সমস্ত কুসংস্কার একে একে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন নবতম যুগের নবতম বিধানের নবতম জ্যোতিতে, সুবিখ্যাত রেম্ব্রাণ্টের চিত্রকর্ম্মের ন্যায়, আমাদের দেশীয় কালো মুখের অর্দ্ধভাগ সাদা হইয়া উঠিবে—মুখমণ্ডলের যে পার্শ্বটা পূর্ব্বপুরুষ-ঘেঁসা সে পার্শ্বটা চিরকালই কালো থাকিবে, আর, যে পার্শ্বটা ইংরেজ-ঘেঁসা সে পার্শ্বটা সাদা হইবে। এইরূপে আমাদের দেশের মুখ অতি এক পরমাশ্চর্য্য দোরঙ্গা শ্রী ধারণ করিয়া জগৎশুদ্ধ লোকের বাহবা-ধ্বনি এবং করতালি আকর্ষণ করিবে।

আমি যেন চক্ষে দেখিতেছি যে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অধীর হইয়া আমাকে এই কথাটি বলিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছেন যে "তোমার যদি এতই মনে ভয়—যে, কৃতবিদ্য লোকেরা তোমার অদ্ভুত শিরোনামাটির অর্থ বুঝিবেন না (সত্য বলিতে কি—উহার অর্থ-না-জানা-দলের মধ্যে আমিও একজন, ও আমার বিশ্বাস এই যে, ও-সকল অলীক গল্প শৈশব কর্ণ হইতে যত দূরে থাকে ততই ভাল) তবে তুমি একটা কাজ কর না কেন—উহার একটা শক্ত সংজ্ঞা দেও—rigid definition দেও—তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে!" ইঁহার এই সৎ পরামর্শটি আমি মাথায় করিয়া গ্রহণ করিলাম। অতএব বলি শুন—

(১) যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র মৃত শরীরে জীবন-সঞ্চার হয়, তাহার নাম সোনার কাটি।

(২) যে কাটি ছোঁয়াইবা-মাত্র জীবন্ত দেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নাম রূপার কাটি।

ইহার উপর তো আর কোন কথা নাই ?

আমাদের দেশের কোনো কোনো মহাপুরুষ ধরা'কে এক পাক, আধ পাক বা সিকি পাক প্রদক্ষিণ করিয়াই তাহাকে সরার মত দেখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যখন মাতাঠাকুরাণীর মুখে বা গৃহিণীর মুখে মাছের ঝোল রন্ধনের কথা শোনেন, তখন তাহার অর্থ কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে—তাঁহারা চট্‌পট্‌ অভিধান খুলিয়া সতেজে পাত উল্‌টাইতে থাকেন! কিন্তু আমাদের শিরোনামাটির অর্থ আমি যখন ইউক্লিডের শক্ত নিয়মে আট-ঘাট বাঁধিয়া প্রদর্শন করিয়াছি, তখন কেহ যে পাশ্চাত্য ফলাইয়া বলিবেন যে, "ওঃ বুঝিলাম! মেম্‌-সাহেবরা যে-রকমের দুইটা কাটি গোঁজাগুঁজি করিয়া মোজা নির্ম্মান করেন—সেই রকমের দুইটা কাঠি;—একটা সোণার, একটা রূপা'র!" এরূপ যে বলিবেন, সে স্বর্গীয় সুখে এ যাত্রার মত তাঁহাকে অগত্যা বঞ্চিত হইতে হইল।

সমাজ-সন্মার্জ্জক বক্তারা যখন বক্তৃতা-কালে মুখ-ব্যাদান করেন, তখন যদি সেই মুখদ্বারে অণুবীক্ষণ ধরা যায় তাহা হইলে এক জিহ্বার পরিবর্ত্তে দুই জিহ্বা স্পষ্ট দেখা দিয়া উঠে,—তাহাই সোণার কাটি, রূপার কাটি। তেমনি আবার প্রত্যেক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কলম-দানে দুইটি করিয়া কলম থাকে—তাহাও সোণার কাটি, রূপার কাটি। একটি লেখনী বা রসনা জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে—সেইটি রূপার কাটি, আর-একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষ্যকে বা সমাজকে বাঁচাইয়া তুলিবার গুণ জানে—সেইটি সোণার কাটি।

আমাকে আপনারা কি ঠাওরান বলিতে পারি না, কিন্তু সত্য বলিতে

কি, আমি সোণার কাটি রূপার কাটি ঝুলির ভিতর করিয়া আনিয়াছি। মা ভৈঃ, আপনারা ভয় পাইবেন না—আমি কোনো মনুষ্যের গায়ে রূপার কাটি ছোঁয়াইব না। নীচত্ব বলিয়া একটা কদর্য্য পিশাচ আছে, সেই মায়াবী পিশাচ কখনো বা উদারতার ছদ্মবেশে, কখনো বা সুবিধার ছদ্মবেশে, আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে! তাহারই গাত্রে আমি রূপার কাটি ছোঁয়াইব। আবার, মহত্ত্ব বলিয়া একজন দিব্য মহাপুরুষ আছেন; তিনি হুজুকের ছাই-এর গাদায় চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবার যোগাড় হইয়াছেন; তাঁহারই গাত্রে আমি সোনার কাটি ছোঁয়াইব। আমার অভিপ্রায় এই রূপ—সু বই কু নহে; অতএব আপনাদের কাহারো কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, "আহা বেচারা নীচত্বকে সকলেই লাঞ্ছনা দ্যায়—ধিক্‌কার দ্যায়—গলা-ধাক্কা দ্যায়—উহার মা বাপ উহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না—উহার ঘরেও স্থান নাই বাহিরেও স্থান নাই;—উহার উপরে—আর কেন! মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা কেন? উহাকে কৃপাকটাক্ষে ক্ষমা করাই উচিত।" এ কথাটি পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত হইলে তাহার উপর আমি দ্বিরুক্তি করিতাম না। কথাটা কিছু হাস্যজনক হইল—ক্ষমা করিবেন। দ্বিরুক্তি করিব কি—উক্তিই তখন আমার ছিল না, শুধু তাহা নয় যিনি উক্তি করিবেন তিনিও তখন অনুপস্থিত; অতএব ও-কথাটা চাপা দেওয়া যাক্। ও কথা বলিবার আমার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাই হো'ক না কেন—এখন আর নীচত্বকে লাথি-ঝাঁটা বা গলাধাক্কার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না,—এখন নীচত্ব দিব্য রথারোহণ করিয়া রাজপথে বিচরণ করে—অবিতর্কিত-ভাবে রাজসভার চূড়া-স্থানে বসিতে আসন পায়—এখন সে মনে করিলেই হাতে মাথা কাটিতে পারে এমনি তাহার প্রখর

বীর্য্য—এমনি তাহার দোর্দণ্ড-প্রতাপ! নীচত্বকে বেচারী গরিব দীন হীন কৃপাপাত্র বলা এখন আর সাজে না। এখন নীচত্ব আমাদের কাছে ক্ষমতাশালী বড় লোক; আমরা তাহার কাছে দীন হীন ক্ষুদ্র লোক। বরং তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাতে তাঁহার পৌরুষ আছে—আমরা যে তাঁহাকে ক্ষমা করি সে অধিকারই আমাদের নাই। দুর্ব্বলের ক্ষমা কাপুরুষতার আর এক নাম; বলবানের ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি ভয়ের তাড়নায় বলবানের অত্যাচার ক্ষমা করে, সে ব্যক্তির যেমন ক্ষমা, আর, যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বলবান্ শত্রু-পক্ষের সহিত বন্ধুতা পাতায়, তাহারো সেইরূপ বন্ধুতা। ওরূপ ক্ষমা—দেখিতে সুকোমল পুষ্পরাশি, কিন্তু উহার তলে তলে প্রতিহিংসা-রূপী কাল-সর্প দংশনের অবসর খুঁজিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়! প্রজাপীড়ক রাজা যখন দুর্ব্বলের লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেন ও বলবান্ শত্রুর গুরুপাপ স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমা করেন—সে ক্ষমা ঐরূপ বিষাক্ত ক্ষমা! সে বন্ধুতাও—লক্ষণ বড় ভাল নহে—তাহা শত্রুতার গুপ্তচর। পরম সাধু শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা দয়ার্দ্র হৃদয়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া যখন দেশ-বিদেশে বন্ধুতা ছড়ান—সে বন্ধুতা ঐ ধরণের বন্ধুতা। পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতি-মহলে রূপার কাটির সংস্পর্শে বন্ধুতা অনেক-কাল-যাবৎ মৃত হইয়া পড়িয়া-আছে ও স্বার্থ-সিদ্ধি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া—অতিশয় সুবিজ্ঞ পাকা-চালে পরের বসত-বাটীতে পদ-প্রসারণ ও ঘটী-বাটীতে হস্ত প্রসারণ এই দুই কার্য্য অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ করিয়াছেন! স্বার্থ-মহাপুরুষ যখন উদার-ভাবে ক্রোড় প্রসারিত করিয়া ভিন্ন জাতিকে আলিঙ্গন করেন, তখন সে আলিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন,—লোহার ভীম হইলেও আলিঙ্গিত ব্যক্তি সে আলিঙ্গনের যাঁতায় পরিপিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ময়্‌দা বনিয়া যায়। সকল-অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সেই ময়দার পুতুলেরা উদারতা ও

সমদর্শিতা ফলাইয়া ঐ প্রকার ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম ও সদ্ভাব বিস্তার করিতে যা'ন—প্রেম বিস্তারের তাঁহারা আর স্থান খুঁজিয়া পাই-লেন না!

প্রেম বিস্তারের একটি বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। তাহা ক-হইতে খ'য়ে ও খ-হইতে গ'য়ে প্রসারিত হয়; কিন্তু খ ডিঙাইয়া গ'য়ে প্রসারিত হয় না—গ ডিঙাইয়াও ঘ'য়ে প্রসারিত হয় না। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে-না-হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জম্‌কিয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এইতর অকাল-পক্ক প্রেম হৃদয়-জননীর গর্ব্ভে আঢ়াই মাস বাস করিয়াই রসনার বক্তৃতায় বা লেখনীর প্রবন্ধে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সকল ইচড়ে পাকা প্রেম হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে! কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বেই লেনিস্ গ্রামার পড়িতে আরম্ভ করে! আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না-পাইতেই অপর লোককে মা বাপ বলিতে শেখে! এ প্রেম একটি মহাবীর,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইনি স্বীয় জন্মভূমির ভাল মন্দ সমস্ত বস্তুকে পুড়াইয়া ছারখার করিতে পারেন ও সাত সমুদ্র চকিতের মধ্যে লঙ্ঘন করিয়া তাহার পারস্থিত অজ্ঞাত অপরিচিত ভূমিতে নূতন গৃহ-প্রতিষ্ঠার পণ্ডশ্রমে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যাপৃত হইতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ধৈর্য্যের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখাই দুষ্কর। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ বলেন সার্ব্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন

বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা—আমরা বলি গাছে-না-উঠিতেই-এক-কাঁদি! এরূপ উদারতা ও সমদর্শিতার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়ানো অতীব কর্ত্তব্য।

প্রকৃত সমদর্শিতা কাহাকে বলে? না "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"—যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার মত করিয়া দেখেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দেখেন। এ সমদর্শিতা পূর্ব্বকালে যোগী-ঋষি-শ্রেণীর মহাত্মাদিগের মধ্যে কচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা মৌখিক সভ্যতার সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া নিতান্ত মরণাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কাহারো গাত্রে সোনার কাটি ছোঁয়াইতে হয় তবে উহারই গাত্রে তাহা আগে ছোঁয়ানো কর্ত্তব্য। কিন্তু এখনকার যাঁহারা সমদর্শী তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ যে, পরকে আপনার মত দেখা যদি সমদর্শিতা হয়, তবে আপনাকে পরের মত দেখা সমদর্শিতা না হইবে কেন? "ডাইন্ হস্ত বাম হস্তের সমান" ইহা বলাও যা, আর, "বাম হস্ত ডাইন হস্তের সমান" ইহা বলাও তা'—একই কথা! কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ডাইন্ হস্তকে বাম হস্তের সমান বলিলে ডাইন হস্তের অপমান করা হয় ও বাম হস্তকে ডাইন্ হস্তের সমান বলিলে বাম হস্তের মান বাড়ানো হয়, তখন তাহাকে "একই কথা" বলিব কেমন করিয়া? মান বর্দ্ধন করা এবং মান খর্ব্ব করা কিছু তো আর একই কথা নহে। তেমনি আবার, "পর'কে আত্ম-তুল্য দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে পর'কে এখন যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে। "আপনাকে পরের মত দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে, আপনাকে এখন যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসিবে;—কম ভালবাসা এবং বেশী ভালবাসা তো আর একই কথা নহে! যদি আপনাকে কম ভালবাসাই শ্রেয় হয়, তবে পরকে আত্ম-তুল্য ভালবাসিতে গেলে পরকেও কম ভালবাসিতে হয়,—ইহাতে ভালবাসার মাত্রা-লাঘব ভিন্ন আর কোনো ফলই দর্শে না। এই কথাটির মর্ম্ম বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা যদি স্বজাতিকে আপনার

নিকটতম জানিয়া তাহাকে রীতিমত ভালবাসার চক্ষে দেখি, স্বজাতির পৈতৃক সৎকীর্ত্তি, সদাচার, সদ্ভাব, সম্মান সমস্তই যদি আমরা অতি যত্নের সহিত রক্ষণ ও বর্দ্ধন করি, তবেই আমরা অন্য জাতির প্রতি ভালবাসা বিস্তার করিবার অধিকারী হই, আর, অন্য জাতিও আমাদের স্বজাতিকে একটা জাতির মত জাতি জানিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা করিয়া সুখী হয়। কিন্তু আমরা ইংরাজী পড়িয়া এরূপ এক অধম জন্তু বনিয়া গিয়াছি যে, আমরা স্বজাতির পৈতৃক কোনো কিছুই দু'চক্ষে দেখিতে পারি না! আমাদের স্বজাতির শত্রুবর্গেরা যেমন আমাদের জাতির মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না, আমরা নিজে আমাদের নিজের জাতিকে তাহা অপেক্ষাও বিষ-দৃষ্টিতে দেখি! আমরা আপনারা যাচিয়া আপনাদের শত্রুপক্ষের দলে মিশি, আপনারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের পর হই! পর'কে আপনার করিতে পারা যেমন একটি মহৎ গুণ, আপনাকে পর করিয়া ফেলা তেমনি একটি মহৎ দোষ। এ দুই বিরোধী বস্তুকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখা কিছু আর সমদর্শিতা নহে— তাহা যার-পর-নাই স্থূল-দর্শিতা। আমরা যদি ইংরাজদিগকে বাঙ্গালী করিতে পারি তবে তাহাতে আমাদের যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ও পৌরুষ প্রকাশ পায়, তেমনি ইংরাজি যাত্রার দলের অধিকারীরা তুড়ি দিবামাত্র আমরা যদি যাত্রার সঙের ন্যায় ইংরাজি নাচ নাচিতে আরম্ভ করি, তবে তাহাতে তেমনি আমাদের অসাধারণ কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের নাই বলিয়া কি শেষোক্ত অসাধারণ কাপুরুষত্ব'কে মাথায় করিয়া পূজা করিতে হইবে? ইহা তো কোনো শাস্ত্রেই লেখে না!

কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল নূতনত্বের ভান উল্টা-ডিগ্‌বাজি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে এম্নি প্রবল বেগে যে, বক্তা-মহোদয়েরা এ কথা বলিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন না যে, "লোকে বলে বেল পাক্‌লে কাকের কি—আমি বলি যে, কাক পাক্‌লে বেলের কি! শাস্ত্রে

বলে যে, পর'কে আপনার মতো দেখিবে, আমি বলি যে, আপনাকে পরের মতো দেখিবে—এবং ইহাকেই আমি বলি প্রকৃত সমদর্শিতা। ইঁহাদের হিত পরামর্শ যদি শোনো—তবে আপনাকে একজন সাতপুরুষে গোরা লোকের মতো ধবলাঙ্গ দেখিবে, আপনার গৃহিণীকে মেম্ সাহেবের মতো দেখিবে; আমাদের এদেশ যদিও উষ্ণপ্রধান তথাপি ইহাকে শীতপ্রধান ইংলণ্ড দেশের মতো দিবাকরের সহিত সম্পর্ক-বর্জ্জিত দেখিবে; আর মনে করিবে যে তুমি কাল্ প্রত্যুষে সবে-মাত্র জাহাজ হইতে নামিয়াছ—ইহার পূর্ব্বে তুমি কিম্বা তোমার কোনো পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষের ত্রিসীমা মাড়ায় নাই; মনে করিবে যে, বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া যে একটা শব্দ আছে, ইহার তুমি বাষ্পও জান না—সুতরাং বাঙ্গালীকে নিগর্ ভিন্ন আর যে কি বলিবে তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ না! কাচ-পোকার আলিঙ্গনে গা ঢালিয়া দিয়া আর্সুলা যেমন কাচ-পোকা বনিয়া যায়, সেইরূপ পরের অধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়া আপনি পর্য্যন্ত আপনার পর হইয়া মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।"

এরূপ সমদর্শিতার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়; নূতন কিছুই গড়িবার প্রয়োজন হয় না—আপনাদের ভাল যাহা কিছু আছে তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেই অভীষ্ট কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপাটীরূপে সমাধা হইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মহলে বহু কাল ধরিয়া এই একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে প্রকৃতি শূন্য স্থানের প্রতি আত্যন্তিক বীতরাগ (Nature abhors vacuum)। এ প্রবাদটি ফলিয়াছে যেমন আমাদের দেশে—এমন আর কোথাও না। ভিতর হইতে বাঙ্গালীরা হিন্দুত্বকে যতই দূর করিয়া দিতেছে—উপর-হইতে ততই ইংরাজিত্বের গুরু ভার অবতীর্ণ হইয়া তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিতেছে। অতএব বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গলা পরিচ্ছদ, বাঙ্গলা জাতি-কুল-মান—সমস্তকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া

বক্তৃতার অ্যাক্-তোপে উড়াইয়া দেও, ও পথের ইংরাজদিগকে করযোড়ে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলো যে, "দেখ আমরা কি মহৎ কার্য্য সমাধা করিলাম! কে বলে যে আমরা নিবীর্য্য বাঙ্গালি! আর কি তোমরা আমাদিগকে নিগর বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারো? আর আমরা হিন্দু নহি—আমরা এক এক জন এক এক উন্নতিশীল দেশহিতৈষী মহাবীর!" যে-কোনো জাতি হউক না কেন, সেই জাতিই এইরূপ সুলভ মূল্যে সমদর্শিতা ক্রয় করিতে পারে। ইংরাজেরা যদি ইচ্ছা করে তবে তাহারা স্বজাতির স্বজাতিত্বকে রসাতলে দিয়া রাতারাতি ফরাসীস হইয়া দাঁড়াইতে পারে;—তখন যদি কোনো বড়-লোক-ইংরাজকে তাঁহার ভৃত্য মোসিঁও বলিয়া সম্বোধন করিতে তিল-মাত্রও বিলম্ব করে, প্রভু অমনি তাহাকে ঘুসার চোটে আদব-কায়দা শিখাইতে উদ্যত হইবেন; তখন সম্ভ্রান্ত ইংরাজদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা পরস্পরকে গুড্ মর্ণিঙ্ না করিয়া বোঁজিওর মোসিঁও বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন; কিন্তু সে দিনের এখনো অনেক বিলম্ব আছে! বাঙ্গালীর সহবাসের বাতাস লাগিতে লাগিতে যদি কোনো সুদূর ভবিষ্যৎ কালে তাঁহাদের কঠিন অস্থিতে নোনা ধরিয়া তাহা মোমের মত পরহস্ত-নম্য হইয়া উঠে—তবেই যাহা হউক; কিন্তু কলিযুগের এদিকে তাহার বিশেষ কোনো সম্ভবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আমি কেবল যদি'র কথা বলিতেছি,—যদি ইংরাজেরা কখনো সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের ন্যায় পরম দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, তবেই তাঁহারা স্বজাতির স্বজাতিত্ব লোপ করিয়া অন্য জাতির স্বদেশকে আপনাদের হোম্ বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন; ও দূর হইতে দূরবীণ কসিয়া, কোকিলের ন্যায় সেই পর-গৃহের গার্হস্থ্য সুধামৃত আস্বাদন করিয়া কার্দিঙ্গের মূল্যে "সমদর্শী" নাম ক্রয় করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তত দেশহিতৈষী হন'ও নাই, তাহার কথাও নাই! আমার মতো অকর্ম্মণ্য

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তিরা বলিতে পারে যে, "উহা তো আর সমদর্শিতা নহে—উহা ভিন্ন-জাতিকে আপনার জাতির মাথায় চড়ানো।" কিন্তু লোকের কথায় কি আসে যায়—বিশেষতঃ নিগর্ বাঙ্গালিদের কথায়! যদি সমদর্শী হইতে চাও তবে বাঙ্গালী লোকে কী বলিবে না-বলিবে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—ফিরিঙ্গী লোকের অমোঘ মহাবাক্য গুলিকে মাথা'র হ্যাট্ এবং গলার কলর্ করিবে।

অন্যান্য সভ্য জাতিরা স্বজাতির স্বজাতিত্ব রীতিমত রক্ষা করিয়া ভিন্ন জাতির সহিত ভ্রাতৃসৌহার্দ্যে মিলিত হয়; কিন্তু আমরা নাকি সকল অপেক্ষা অধিক সভ্য,—মুসলমান জাতি বলো—ফরাসিস জাতি বলো—ইংরেজ জাতি বলো—পূর্ব্বতন হিন্দু জাতি বলো—সকলকার অপেক্ষা আমরা নাকি অধিক উন্নত, অধিক বিদ্বান্, অধিক বুজ্দার, তাই আজিও কেহ যাহা পারে নাই আমরা তাহা অম্লান বদনে করিতে যাইতেছি! আমরা স্বজাতির স্বজাতিত্ব একেবারেই লোপ করিয়া পরজাতির আলিঙ্গনের জটিল নাগ-পাশে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে ধরাবাঁধা দিতেছি। মাকড়সার পা-গুলা বড় বড়, ইহা দেখিয়া মাছি মনে করিতেছে যে, মাকড্সার কাছে কিছুদিন সাক্রেতি করিলেই তাহারও ঐরূপ অসাধারণ পদ-বৃদ্ধি হইতে পারে, এই ভাবিয়া মাছিটি মাকড্সার জাল-প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে!

ভেক এবং সারসের ইতিহাস কাহারো অবিদিত নাই। একদল ভেক সারস-পক্ষীর সমীপে গিয়া তাহাকে জোড়-করে নিবেদন করিল যে, "হে উচ্চ-পদারূঢ় শুভ্রবর্ণ শুভ্রান্তঃকরণ সারসপক্ষী, আমাদের রাজা এই একটা নির্জীব কাষ্ঠ-খণ্ড বই না—ইহার রাজত্বে আমাদের কোনো শুভ নাই। তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজ-সিংহাসন অধিকার কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন তোমার জয়-জয়কার করিব। তাশুধু না—বক্রমতি বক্রগতি নৃশংস সর্পেরা ঝোপঝাপের

আড়ালে মাথা গুঁজিয়া যেখানে সুনির্ভয়ে বাস করে সেই সকল গহন বনে প্রতিদিন দলবল-সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবে।” ভেকদিগের এরূপ শাঁসালো এবং রসালো আহ্বানে সারসের কর্ণ কখনও বধির থাকিতে পারে না; তিনি আড়চক্ষে ভেক-রাজ্যের চতুঃসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই সিংহাসনের উপর ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর-এক চরণ বাড়াইলেন, আর, দুই চরণ যখন সেই ভিত্তি-মূলের উপর দৃঢ়রূপে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রজাগণের ক্রন্দন জন্মের মতো ঘুচাইবার জন্য টুপ্‌টাপ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রজাদিগের আনন্দের গগনভেদী উচ্ছ্বাস শোকাশ্রু-ধারায় পরিণত হইতে লাগিল; ও ঘরে ঘরে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। আমাদের দেশের বক্‌বক্‌কারী ভেকের দল চাহেন যে, শুভ্র সারসবৃন্দ একবার কৃপা-কটাক্ষে দেখুন যে, আমাদের নিজের জাতি নাই, গৌরব নাই, পরিচ্ছদ নাই, আমরা অতি-ই অসভ্য, অতি-ই বর্ব্বর,—তাঁহাদের কৃপা-ই আমাদের অকূলের কূল। আইস আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, “আমরা যখন এত উদার হইতে পারিলাম যে, আমাদের জাতিকুলমান সমস্তই আমরা তোমাদের সভ্যতা-সলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে একটুও কুণ্ঠিত লজ্জিত বা সন্তপ্ত নহি, তখন তোমরা কি আমাদের প্রতি এ-টুকুও উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না যে, তোমাদের বাম চরণের সুমার্জ্জিত উপানতের অর্থাৎ বুটের সোণার কাটি ছোঁয়াইয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালী-জনের মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার করিবে! বাবু উপাধি আর তো আমাদের সহ্য হয় না! ধুতি চাদর আমাদের গাত্রে স্নাইসোর্প্শের বেলেস্তারা ঠ্যাকে! জঘন্য বাঙালী নাম বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, আমাদের কর্ণকুহরে বিষ বর্ষণ করে! অতএব হে শুভ্রবর্ণ শুভ্র-হৃদয় সারস-পক্ষী সকল! তোমরা এ অধীন ভেক

মণ্ডলীকে সমূহ দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর! তোমরা আমাদিগকে তোমাদের স্বজাতি বলিয়া—নিদেন-পক্ষে উইরেসিয়ান (অর্থাৎ ভেক-সারস) বলিয়া—তোমাদের বুট্-মণ্ডিত পাদপদ্মের আশ্রয়ে টানিয়া লও—তোমাদের শ্রীচরণের পাদুকা-ই আমাদের ভবার্ণবের ভেলা—তোমরাই আমাদের বিপদ্-সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী।" চুণকাম করা শুভ্রান্তঃকরণ সারস-পক্ষী যে-অভিপ্রায়ে ভেকদিগের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ভেকদিগের অত বেশী অনুনয়-বিনয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ;—ভেকেরা যে কি উপাদেয় বস্তু সারসের তাহা বিলক্ষণই জানা আছে। ভেকেরা কাকুতি মিনতি করিয়া অধিক কি আর জানাইবেন ? বরং সারস পক্ষী ভেকদিগের বক্‌বক্ বকুনি এবং থপ্‌থপ্ লাফানি'তে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে চরণের আশ্রয় না দিয়া চরণের ঠোকর দিবেন কি না তাহাই ভাবিতে থাকেন ; পরে অনেক বিবেচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, আপাতত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চরণ সম্বরণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সারস ভাবেন যে, "সকল-পক্ষিজাতির মধ্যে বকজাতি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ,—আমরা সেই বক-জাতির বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কুল-শ্রেষ্ঠ সারস পক্ষী। সকল জীবেরাই জানে যে, আমরা যেমন প্রজাবৎসল এমন আর কেহই না! অতএব এই ভেকগুলাকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারা-ই কর্ত্তব্য!" এই ভাবিয়া সারসপক্ষী যথনই চঞ্চুচালনা করেন, তখনই শ্বেত পক্ষ-দিয়া চঞ্চু আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে কার্য্যে কর্ত্তা'র সহিত প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপে সারসপক্ষী স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও জন্ম জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন ; কী ? না সুধীর পাকা চা'লে ছুঁচ্ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল্ হইয়া বাহির হওয়া। ভেকেরাও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং জন্ম জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন ; কী ? না সকলে মিলিয়া

সমস্বরে বক্ বক্ ধ্বনি করা। এইরূপে রাজা প্রজা উভয়ে মিলিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে এমনি প্রচণ্ড বেগে যে, দেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উর্দ্ধশ্বাসে বলিবে শেষে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি !"

ভেকেরা যদি স্বজাতিত্বের কোন প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া তাহার ভিতর আপনাদিগকে কোন-মত-প্রকারে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে কালক্রমে তাঁহারা আপনাদের জাতিসুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া বড় বড় সোণা ব্যাঙ্‌ হইয়া উঠিতে পারেন। তাহা যদি তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে, তবে তখন মণ্ডূক-গলাধঃকরণ সারসের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ভেকেরা আপনাদের জাতি-সুলভ উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারসের পরিচ্ছদ পরিয়া সারস হইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন—এই এক নূতন রহস্য !

আমাদের নামের শিরোভাগে বাবুশব্দ প্রয়োগ না করিয়া তাহার পশ্চাদ্-ভাগে ইস্কোএয়ার-শব্দের লাঙ্গূল জুড়িয়া দেওয়া অতি সহজে হইতে পারে—যে-কেহ মনে করিলেই তাহা করিতে পারে ; কিন্তু তত সহজে আপনার বা স্বদেশের উন্নতিসাধন কাহারো কর্ত্তৃক ঘটনীয় নহে। আমরা মনে করিলেই এক লম্ফে গাছে উঠিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করিয়া উন্নতির সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শ্রেয়োমঞ্চে উত্থান করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমরা এরূপ লঘুচিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, যে কার্য্য আমরা জগঝম্প বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বীরত্ব ফলাইয়া একলম্ফে সাধন করিতে পারি তাহা অতি যৎসামান্য হইলেও আমাদের চক্ষে তাহা অতি-বড় মহৎ কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; ও ধীর গম্ভীর ভাবে যথাবিহিত সদুপায় অবলম্বন না করিলে যে-কার্য্য সাধন করা যায় না তাহা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইলেও—অতি মহৎ-কার্য্য হইলেও—আমাদের চক্ষে তাহা অতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতিভাত

হয়। :আমরা ভাবি যে, আপনার দেশের গৌরব বাঁচাইয়া—মহত্ব বাঁচাইয়া —রীতিমত স্বদেশের উন্নতি-সাধন করা ভূতগত পরিশ্রমের কার্য্য—তাহা করিবার জন্য কাহার কী এত গরজ পড়িয়াছে! পৃথিবী-যোড়া উদারতা—জগৎ-যোড়া সমদর্শিতা—ইংলণ্ড-যোড়া অনুকরণ-ক্ষেত্র—এ-সকল তো আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে,—উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই অনায়াসে আমরা তাহা করায়ত্ত করিতে পারি—অতি সুলভ মূল্যে মহাবীর উপাধি ক্রয় করিতে পারি। তাহার উপায় হ'চ্ছে এই—আপনাদের যাহা কিছু ভাল বলিয়া জানো—ভদ্র-রীতি বলিয়া জানো—দেশের গৌরব বলিয়া জানো—পিতৃপুরুষদের মহামূল্য দান বলিয়া জানো—তাহা সুগন্ধ পঙ্কজ-কানন হইলেও—উন্মত্ত হস্তিযূথের ন্যায় তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফ্যালো। স্বদেশের যে কোনো চিরপ্রথিত কীর্ত্তিস্তম্ভের শিখর-প্রদেশে যে-কোনো আলোক দেখিতে পাও—জ্ঞানের আলোকই হউক্—প্রেমের আলোকই হউক—ধর্ম্মের আলোকই হউক—বক্তৃতার ঝড়ে সমস্তই নির্ব্বাণ করিয়া ফ্যালো। তাহার পর এরূপ একটা বৃহদাকার প্রদাহক ও প্রবর্দ্ধক কাঁচ প্রস্তুত কর যে, তাহা ইংলণ্ডের তিল-প্রমাণ বস্তুকে তাল-প্রমাণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ও তাহার মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের সমস্ত প্রতাপের আলোক আমাদের দেশের মস্তকের উপর কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। সেই প্রতাপানলের উত্তাপে যখন আমাদের দেশের সমস্ত মস্তিষ্ক দ্রবীভূত হইয়া রাস্তা-ঘাটে গড়াইয়া যাইতে থাকিবে, তখন উদারতা-প্রভৃতি ধেড়ে ধেড়ে কতকগুলি শব্দের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া সেই জ্বলন্ত মস্তিষ্করাশিকে সেই সকল ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশের উন্নতির নানা প্রকার উপকরণ গড়িয়া তুলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনার সার্ব্বভৌমিক উদারতা-প্রকাশেরও অবশিষ্ট থাকিবে না, স্বদেশের উন্নতি-সাধনেরও অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের মধ্যে এখনো এরূপ অনেক সদাচার আছে—সাধুতা আছে—ভদ্রতা আছে—বিনয় আছে—মনুষ্যত্ব আছে—যাহা অন্যত্র কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না ; কিন্তু আমরা মনে ভাবি যে, ও-সকল তো আমরা চির-কালই দেখিতেছি—দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চক্ষুতে মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে ! আবশ্যক হইলেই যথন আমরা অন্যের ধন ভিক্ষা করিতে পারি তথন স্বীয় পৈতৃক ধন রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিবার কষ্টের বোঝা শুধু শুধু কেন স্কন্ধে বহন করিব ? অতএব পৈতৃক সদাচার জলে নিক্ষেপ কর, পৈতৃক সুরীতি, সৌজন্য, সুপরিচ্ছদ, সমস্তই জলে নিক্ষেপ কর,—এইরূপে ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া আম্রবৃক্ষের পরিবর্ত্তে ফল-রাণী ইষ্ট্রাবেরি (কিনা টেপাবির বড়দিদি) রোপন কর ; শতদল শ্বেতপদ্মের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দল ইউরোপীয় লিলি রোপন কর; বীণাপাণি সরস্বতীকে নিউসের মিউ-মিউ-ছন্দে আহ্বান কর, মালাচন্দনে ভূষিত বেদীকে কালো ঘ্যাটাটোপে ঢাকা পুল্‌পিটের মতো করিয়া গঠন কর ও বক্তাকে শুভ্র পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কালো গাউন পরাইয়া বিলাতি মুর্দাফরাস সাজাও। যাহা কিছু প্রবল জাতির তাহার সাত খুন ক্ষমা কর—শক্তের গোলাম হও ! আর যাহা কিছু স্বজাতির চিরারাধ্য গৌরবের বস্তু তাহার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়াও—দুর্ব্বলের যম হও ! এই সমস্ত উপায় অবলম্বনপুরঃসর এক যৎসামান্য কাণাকড়ির মূল্যে জগদ্ব্যাপী উদারতা ও সমদর্শিতা ক্রয় করিয়া পুত্র-পৌত্রানুক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাক।

আমরা এককালে বলবান্ জাতি ছিলাম—এখন দুর্ব্বল হইয়াছি। কিন্তু সূর্য্য যথন অস্ত যায় তথন তাহা সূর্য্যই থাকে—জোনাকি পোকা হয় না। পুরুরাজ আপনার অস্তগমনের সময় বীরকেশরী আলেক্‌জাণ্ডারকে মহত্ত্ব যে বলে কাহাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন—দেখাইয়াছিলেন যে, পিঞ্জরস্থ সিংহও সিংহ ! আলেক্‌জাণ্ডার যথন বন্দীকৃত পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা

করিলেন যে, আমার নিকট হইতে তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, পুরুরাজ বলিলেন—"যেরূপ ব্যবহার রাজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য!" পুরুরাজ যদি আমাদের ন্যায় উন্নতমনা হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে "তোমরা আমাকে তোমাদের একজন জাতি-ভাই বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমি পরম কৃত-কৃতার্থ হইব!" আমাদের আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিতে যদি এতই আমাদের লজ্জা বোধ হয়—আপনার পিতাকে যদি পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তবে যাঁহাদের আমরা রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতেও তো তাঁহাদের মহত্ত্বটুকু আমরা শিক্ষা করিতে পারি—তাহাই বা করি কই? ইংরাজেরা তাঁহাদের দেশের বিদ্যার্থী জন-সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন, তা' বই—বিশেষ কোনো গুরুতর কারণ উপস্থিত না হইলে অন্য দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন না;—এইটি কেন আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে না শিখি? আমরা তাঁহাদের এত এত বিদ্যা শিখিতেছি, কেবল ঐটি শিখিলেই কি আমাদের জাতি যাইবে! ইংরাজ-দের নিকট হইতে আমরা বিদ্যা শিখিতেছি বলিয়াই যে, তাঁহাদের ভাষার জোয়ালে আমাদের ঘাড় পাতিয়া দিতে হইবে—ইহার যে কি বাধ্য-বাধকতা তাহা তো দেখিতে পাই না। ইংরাজেরাও তো আমাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরোক্ষ সম্বন্ধে বীজগণিত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা বলিয়া তাহারা কি আমাদের ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? ইউরোপীয় জাতি উক্ত বিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আরবদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে—তা বলিয়া কোন্ ইউরোপীয় জাতি আর্‌বী ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত Science Association আমাদের না ইংরাজদের? যদি তাহা আমাদেরই হয়, তবে সেখানে-অন্ততঃ—কেন আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন না

করি ?* আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলে—তো কোনো কথাই ছিল না, তাহা হইলে এতদিনে আমরা জাতির মতো জাতি হইতাম—মানুষের মতো মানুষ হইতাম ! কিন্তু অপার্য্যমানে আমরা বিদেশী ইংরাজেদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলেও কতকটা আমাদের দাঁড়াইবার স্থান হয়। যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজদের বহিঃপরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাহাদের দেশের মহত্ত্বটুকুর মর্ম্মে তলাইতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিদ্যা শিখিলেই বা কি আর শিল্প শিখিলেই বা কি—কিছুতেই কিছু হইবে না,—তাহাতে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে। জঠরানল না থাকিলে যেমন অন্ন পরিপাক পায় না,—মহত্ত্ব না থাকিলে সেইরূপ বিদ্যা পরিপাক পায় না ;—নীচত্বের উপর যতই বিদ্যার জ্যোতি নিপতিত হয়, ততই—কোথায় তাহার আলোক বৃদ্ধি পাইবে—না কেবল তমো-ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ;—হিতে বিপরিত হয় ! ইংরাজী পুঁথি-গত বিদ্যাটি ইংরাজদের নিকট হইতে আদায় করা খুব সুবিধা বটে, কিন্তু ইংরাজদের দেখাদেখি আমরা যদি স্বদেশীয় ভাষায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যার অনুশীলন করি, তবে তাহাতে আমাদের দেশে সুবিধার একটা বালি'র বাঁধ শুধু না —পরন্তু মহত্ত্বের শৈলদুর্গ—স্বাধীনতার ভিত্তিমূল—প্রতিষ্ঠিত করা হয় ;—এই সোজা কথাটা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না ! হায় ! আমরা কি কেবল আপাত-সুলভ সুবিধাই খুঁজিয়া বেড়াইব ? ভাবী-মঙ্গলের নিদান যে, মহত্ত্ব, তাহার প্রতি কোনো কালেই কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না ? ইংরাজেরা তো সুবিধা-হস্তীর পদতলে স্বজাতির স্বজাতি-

* এখানে লেখকের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা হইল মাত্র,—উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি দোষারোপ করা এখানকার তাৎপর্য্য নহে,—ব্যাপারটি অতি কঠিন—প্রতিষ্ঠাতা-মহাশয় যত দূর করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের সকলকার ধন্যবাদের পাত্র, ইহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না।

ত্বকে দলিত-বিদলিত করিয়া বধ করেন না! আমাদের দেশের লোক যেমন সুবিধার কারণ দর্শাইয়া বিদেশীয় গলবস্ত্রকে স্বদেশীয় কণ্ঠের হার, বিদেশীয় কালো চোঙার টুপিকে স্বদেশের মাথার মুকুট করিতে তিলমাত্রও লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করেন না, কোন্ ইংরাজ সেরূপ স্বজাতিত্বের অবমাননা আপনার গাত্রে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারে? তাহা যদি পারিত, তবে আমাদের এই উষ্ণ দেশে উত্তাপের কারণ দর্শাইয়া স্বচ্ছন্দে তাহারা ধুতি-চাদর পরিয়া শরীরের অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিত—তাহাদের গাড়ে বাতাস লাগিত—এ যাত্রার মতো তাহারা বর্ত্তিয়া যাইত!

ইংরাজদের এই যে একটি—রসনাগত নয়—কিন্তু—অস্থিগত—মজ্জাগত—মর্ম্মগত স্বদেশানুরাগ, এটি যদি আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিতাম—তবে আর আমাদের ভাবনা ছিল না! তাহা হইলে এতদিনে আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত—কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না,—ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা পরিবার সাজ শিক্ষা করিব, চলিবার ঢঙ্ শিক্ষা করিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপি হেলাইবার কেতা শিক্ষা করিব, পা নাচাইয়া শিশ্ দিবার ভঙ্গী শিক্ষা করিব, খঞ্জন পক্ষীর মতো কোর্ত্তার ল্যাজ নাচাইয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা করিব, এইরূপ যত কিছু শিখিবার আছে সমস্তই মস্তিষ্ক-জাং করিয়া ডার্‌-উইন্ সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব।

সুবিধা স্বতন্ত্র এবং মহত্ত্ব স্বতন্ত্র। আমার নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকিতেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে আমি খুব সুবিধা মনে করিতে পারি, কিন্তু আমি সেরূপ কার্য্য করিলে আমার নীচত্ব আর কাহারো নিকটে অপ্রকাশ থাকিবে না।—যাঁহারা আপনাদের জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া পরেদের পদতলে মস্তক অবনত করিয়া তাহাদের

জাতিকুল-মানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে আদবেই লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহাদের নীচত্বের চিহ্ন তাঁহাদের ললাটময় ফুটিয়া বাহির হয়। তাঁহারা আপনারা তাহা দেখিতে পান না বটে কিন্তু দেশশুদ্ধ আর সকল লোকেই তাহা দেখিতে পায় ;—দেখিয়া ভদ্রলোকেরা সত্য সত্যই মনোমধ্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। সে দিন লর্ড ডফরিন্ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি কম দুঃখে বলেন নাই ; Lord Duffrin কয়েকজন কোর্ত্তা-ধারী বিলাত-ফের্তা Mr. অমুক'কে পষ্টাপষ্টি বলিয়াছিলেন—"তোমাদের এ-দুর্ব্বুদ্ধি কেন ! তোমাদের আপনাদের দিব্য সুন্দর পরিধান বস্ত্র থাকিতে—পরজাতির নিকট হইতে বেমানান্ পরিচ্ছদ ধার করিতে যাও কেন ?" ইহা-শ্রবণে লেখকের একজন আত্মবৎ প্রাণবন্ধুর মুখ হইতে নিম্নলিখিত দোহাটি (অর্থাৎ coupletটি) সহসা বাহির হইয়াছিল ; যথা,—

এ'লেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্ত্তাকুর্ত্তি।
অর্দ্ধ গোরা, অর্দ্ধ কালা, বর্ণচোরা মূর্ত্তি॥

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লোকদিগকে এইরূপ বুঝানো হইতেছে যে, "ডফ্‌রিনের মত অতবড় একজন ভুখোড় গূঢ়াভিসন্ধি নয়-পণ্ডিত আমাদের এদেশে কখন পদার্পন করিয়াছেন কি না সন্দেহ ! তিনি যাই-ই বলুন আর যাই-ই কহুন্—স্বীয় অন্তঃকরণ-মধ্যে তিনি এটি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বাঙ্গালীরা একবার যদি হ্যাট-কোট পরিতে শেখে তবে আর রক্ষা থাকিবে না ! বাঙ্গালীরা হ্যাট-কোট পরিলেই তাহাদের বক্তৃতাশক্তি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে—ইংরাজি সরস্বতী উপযাচিকা হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন—ও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিনের মধ্যে একবার করিয়া

প্রত্যহই হ্যাট কোট পরিতেন, নহিলে তিনি কখনই অত বড় একজন দেশবিখ্যাত লোক হইতে পারিতেন না! এখনো যে এদেশীয় বিদ্বন্ম-গুলীর অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে যে, তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে অতি সংগোপনে অন্ততঃ একবার করিয়া হ্যাট কোট-পরিধান পূর্ব্বক মস্তিষ্ক শানাইয়া ল'ন! বাঙ্গালীরা গোপনে হ্যাট-কোট পরিয়াই এই—প্রকাশ্যে হ্যাট-কোট পরিলে কি আর রক্ষা রাখিবে! তখন তাহাদের আর এক ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে! সিক জাতি তখন তাঁহাদের কাছে কোথায় লাগে! তখন তাঁহাদের মুখের সাপটে ও পদের দাপটে হাইলাণ্ডরের রেজিমেণ্ট-কে-রেজিমেণ্ট্ ভয়ে কম্পমান হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে! ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের এইরূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া লর্ড ডফ্রিণের মতো অত বড় একজন দূরদর্শী বিচক্ষণ-ব্যক্তির আর-কি চুপ করিয়া থাকা পোষায়?—কাজেই তিনি চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া গোটাকত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু যাঁহারা লর্ড্ ডফ্রিণের মাথার ভিতর অত-টা তলাইতে পারেন নাই, তাঁহারা আমাদের ন্যায় সাদাসিধা বুঝিয়াই ক্ষান্ত—তাঁহারা বলেন যে, লর্ড্ ডফরিন্ আপনি যেমন অন্য জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া সঙ্ সাজিতে লজ্জা বোধ করেন—তাঁহার আপনার সেই মহদ্ভাবটি তিনি আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতেও প্রত্যাশা করেন। মহৎ লোক মাত্রেই ভদ্রবংশীয় লোকের নীচত্ব চক্ষে দেখিতে পারেন না। লর্ড্ ডফ্রিণের অপরাধ এই যে তিনি অরুচির কর্ণে সুরুচির গোটা-দুই সৎপরামর্শ গিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। তাহা জীর্ণ হইবে কেন! তাহা যেমন কর্ণে যাওয়া—আর-অম্নি কালো কালো পিত্তের সহিত শ্রোতার মুখ-কন্দর এবং লেখনী-চঞ্চু হইতে উদ্বান্ত হইয়া রাজ্য-শুদ্ধ সংবাদ-পত্র ভাষাইয়া একাকার করিয়া দি'ল।

ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে যাঁহাদের সাধ যায়, তাঁহাদের অনেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পূর্ব্ব-হইতেই অনেকগুলি যুক্তি মুখস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন। কিন্তু সে যে তাঁহাদের যুক্তির ধারা, তাহা এরূপ উপহাসাস্পদ ও জঘন্য যে, তাহা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। তাঁহাদের একটি প্রধান যুক্তি এই যে, রেলওয়ে-রক্ষক হ্যাট-কোটের ভেল্‌কি-বাজির চোটে বাঙ্গালীদিগকে ইংরাজ মনে করিয়া তদুপযুক্ত-সম্মান প্রদর্শন করিবে। ইংরাজী, বাঙ্গালী, সংস্কৃত, আরবি পারসি,—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যে ব্যক্তি যাহা নয়—সে ব্যক্তি যদি তাহার মতো সাজ সাজে, তবে তাহার সেরূপ কার্য্য চৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা—তাহা আত্ম-চৌর্য্য! আপনাকে চুরি করিবার ন্যায় অধম কাপুরুষত্ব জগতে নাই—তাহা অতি গর্হিত নীচ কার্য্য। কোন্ ভদ্রলোক (অথবা বাবু শব্দের ন্যায় ভদ্রলোক শব্দের প্রতি কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে—তবে) কোন্ gentleman সুবিধার ছুতা করিয়া আপনার নাম ভাঁড়াইতে—বংশ ভাঁড়াইতে—জাতি ভাঁড়াইতে—বাপ পিতামহ ভাঁড়াইতে লজ্জিত না হ'ন! রেলওয়ে-রক্ষকের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহার নিকট হইতে বন্ধুতা আদায় করিলে, কিম্বা উপর-ওয়ালাদের পায়ে রীতিমত তৈল দান করিয়া এমন কি আবশ্যক হইলে আপনার যথাসর্ব্বস্ব ধন-সম্পত্তি অকাতরে ঢালিয়া দিয়া—ভদ্রতার একটি নিদর্শন-পত্র বা certificate ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, তাহা আপনার ললাটে আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিলে, রেল-যাত্রীর পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সে সুবিধা এমন কোনো অসাধারণ সুবিধা নহে যে, তাহার পদতলে হৃদয়ের মহত্ত্ব বিক্রয় না করিলে আর শ্রেয় নাই। বিজেতা-জাতির নিকট বিজিত জাতিকে অনেক সময় অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয়—ইহা খুবই সত্য, কিন্তু বিজিত জাতি আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টায় প্রাণপণে নিযুক্ত হউন না কেন—তাহাই তো

মনুষ্যোচিত কার্য্য ! সেদিন বই না কোনো হিন্দুস্থানী খোট্টাকে রেলগাড়ি-রক্ষকেরা কোন-প্রকার অসম্মান করাতে অনেক হিন্দুস্থানী এক-যোট হইয়া রেলগাড়িতে দ্রব্যাদি সংক্রামণ বন্ধ করিল যেই—তাহার পরদিন যাইতে না-যাইতে রেলওয়ে কোম্পানি শশব্যস্ত হইয়া হিন্দুস্থানী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আর পথ পাইল না। সে-দিন ইটালীতে যখন বিদেশীয় রাজপুরুষেরা তামাকের উপর মাশুল চড়াইল তখন ইটালীর লোকেরা কি করিল? আবেদনও করিল না ও তাহার বিনিময়ে গলাধাক্কাও খাইল না। তাহারা অতী এক সহজ উপায় অবলম্বন করিল,—দেশশুদ্ধ লোক একাত্মা হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিল—চুরট্ খাওয়া বন্ধ করিল,—সুবিধাকে পদে দলন করিয়া মহত্ত্বকে আলিঙ্গন করিল! কিন্তু আমরা সুবিধার ঘরের একজন অধম কিঙ্করকে দেখিয়াছি কি অমনি তাহাকে আপনার মাথার উপরে চড়াইয়া সহরময় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকি। সত্য বলিতে কি—এইটিই হ'চ্চে আমাদের ইংরাজি পড়া'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল! যিনি রেলওয়ে-রক্ষকের সৌহার্দ্দের কাঙ্গালি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "তুমি যদি জাতি-ভাঁড়ানোর নীচত্ব অষ্ট-প্রহর অঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে, তবে দুই মিনিটের জন্য রেলগাড়িরক্ষকের কটু-কাটব্য কর্ণাভ্যন্তরে স্থান-দান করিতে তোমার এত ভয়ই বা কিসের, লজ্জাই বা কিসের, গ্লানিই বা কিসের!

ইংরাজী কোর্ত্তানুরাগীর আর-একটি যুক্তি এই যে, "আমাদের নিজের কখন কিছু ছিলও না—এখনো কিছু নাই,—আমাদের পরিচ্ছদ অতীব যৎসামান্য—বড় জোর ধুতি চাদর! মান্ধাতার আমল-হইতে আমরা পর-জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া পরিয়া আমাদের হাড় পাকাইয়া তুলিয়াছি, আজ তুমি আমাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে চাও? অনুকরণই আমাদের

এক মাত্র পাথেয় সম্বল—তাহা আমাদের চিরকেলে পেসা, তাহার সুবিধা হইতে আজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাও?" Prince Henry যখন Falstaff-কে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি এই বলিলে—চুরি করিবে না, আর, এখন যেই চুরির নাম শুনিয়াছ আর অমনি নাচিয়া উঠিয়াছ, তোমার তো খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখ্‌ছি!" Falstaff বলিল "Tis my vocation Hal" চুরি হ'চ্ছে আমার পেসা—আমার ব্রত "Tis no sin to labour in one's vocation" ব্রত পালন করা তো আর পাপ-কার্য্য নহে? "অনুকরণ যে আমাদের ব্রত—তাহা কিরূপে আমরা লঙ্ঘন করিব? অনেকে অনেক স্থানে প্রবঞ্চনা-বলে ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করে ও তোপের বলে ফাল হইয়া বাহির হয়; আমরা নীচত্বের বলে মাছি হইয়া ইংলণ্ডের অধম শুণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করি ও অনুকরণের বলে এক এক জন এক এক ধিঙ্গী হইয়া বাহির হই;—ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই তোমার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, নচেৎ তুমি কখনই আমাদের সৎ-সংকল্পে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিবার মানসে (cold water throw করিবার মানসে) আমাদের পথরোধ করিয়া এখানে আজ দণ্ডায়মান হইতে না।"

"আমরা চিরকালই পরজাতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিতেছি"—এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা মুসলমানদিগের দেখাদেখি সভ্য পরিচ্ছদ পরিতে শিখিয়াছি—তবে ও-কথাটির মূল যে কোথায়, তাহা তো আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। চক্ষে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। আমাদিগকে যদি কেহ বলে যে, "সূর্য্য যেহেতু পশ্চিম দিকে উদয় হয় এই জন্য আমি গঙ্গার পূর্ব্ব-ধারে বাড়ী করিয়াছি", তবে আমরা তাঁহাকে বলিব যে, তোমার কথার বিস্‌মোল্লায় গলদ্; আমরা যাহা প্রত্যহ দেখি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। তুমি বলিতেছ যে, হিন্দুরা মুসলমানের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে—

আমি দেখিতেছি মুসলমানেরা হিন্দু-দিগের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে।

হিন্দুস্থানী মুসলমান ছাড়া আর যে-কোন দেশীয় মুসলমানকে দেখ না কেন,—ইরাণী মুসলমান, তুরাণী মুসলমান, আরবি মুসলমান, কাবুলি মুসলমান, যাহাকেই দেখ না কেন—দেখিবে যে, হিন্দুস্থানী মুসলমানদের পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহাদের পরিচ্ছদের কোনো সাদৃশ্য নাই; ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, এ দেশীয় মুসলমানেরা যেমন আমাদের বীণ ভাঙিয়া সেতার করিয়াছে, মল্লার রাগিণী ভাঙিয়া মিঞা মল্লার করিয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাষা ভাঙিয়া উর্দু সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ ভাঙিয়া চাপ্‌কান পায়জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে। যে-জাতি একশত বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী, সে জাতি যে, এক-শ এক বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী হইবে—ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। প্রথম প্রথম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর কেবল মারামারি কাটাকাটি সম্বন্ধেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; অবশেষে রাজনীতিজ্ঞ আক্‌বর শা হিন্দুদিগকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে হিন্দু-সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন—ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। আবার আক্‌বারের সময় হইতে মুসলমান রাজারা যেরূপ জামা-জোড়া ও খিড়্‌কিদার পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করিতেন সেরূপ পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ-ছাড়া পৃথিবীস্থ আর কোনো দেশেই প্রচলিত নাই—ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সে পরিচ্ছদ-গুলি নিতান্ত-পক্ষেই ভারতবর্ষীয়; সে গুলি যদি মুসল্‌মানী হইত তবে তাহা ইরানে, তুরাণে, আরবে, বা অন্য কোন মুসল্‌মানী দেশে অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। আমাদের দেশের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জামাজোড়া ও খিড়্‌কিদার

পাগ্‌ড়ি আমরা মুসল্‌মানদিগের নিকট হইতে পাই নাই, মুসল্‌মানেরাই আমাদের নিকট হইতে পাইয়াছে। মুসল্‌মানেরা যখন হিন্দুদের শত শত বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছে, তখন আমরা যদি এখন তাহাদের কোন কিছুর অনুকরণ করি তবে তাহাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সৌজন্যের বিনিময় হয় মাত্র; কাহারো তাহাতে জাতির অগৌরব হয় না। পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের ধর্ম্মের প্রতিই খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতিকে তাঁহারা মাথায় তুলিয়াছিলেন; মুসলমান সম্রাটের প্রধান সেনা-পতি ছিলেন মানসিংহ, প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন তোদরমল, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বীরবল, প্রধান গায়ক ছিলেন তান-সেন। ইঁহারা সকলেই জাতিতে হিন্দু। যে-জাতি আমাদের জাতির ভাষা ভাঙ্গিয়া আপনাদের উর্দ্দু-ভাষা প্রস্তুত করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইল না, এমন কি, যে জাতি আপনা-দের জন্ম-ভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষকে স্বদেশ-রূপে বরণ করিল, সে জাতিকে কি আমরা আর পর বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি? তাহা যদি করি তবে তাহাতে আমাদের নিতান্তই অসৌজন্য প্রকাশ পায়—তাহা অত্যন্ত অভদ্রোচিত কার্য্য। বাঙ্গালি মুসলমানেরা ধূতি পর্য্যন্ত পরে, মুসলমানীরা সাড়ি পর্য্যন্ত পরে, তাহাতে তাহাদের জাতি যায় না। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধর্ম্মেই কেবল মুসলমান—কিন্তু জাতিতে ভারতবর্ষীয়। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জিত-জেতা সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোনো হিসাবেই আমাদের পর নহে। তাহাদের দেশ হিন্দুস্থান—ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী,—এবং উভয়েই আমরা জিত জাতি। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা পূর্ব্বে আমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া এখন যদি আমরা তাঁহাদের কোনো কিছুর অনুকরণ করি, তবে আমরা আপনাদের লোকেরই অনু-করণ করি—পরানুকরণ করি না। পরানুকরণ বলে কাহাকে? না

যে-জাতি আমাদিগকে তাহার চরণের এক রেণু বলিয়াও গণ্য করে না—সেই জাতির অনুকরণই পরানুকরণ। সময়ে সময়ে আমরা* মুসলমানদের বাহুবলে মর্দ্দিত হইতাম, ও সময়ে সময়ে আমরাও তাহাদিগকে তাহার প্রতিফল দিতাম; এখন আমরা কাহারো বাহুবলে মর্দ্দিত হই না বটে—কিন্তু পদমর্দ্দিত যত দূর হইবার তাহা হইতেছি; বাহুবলের পীড়নে লোকের প্রাণহত্যা পর্য্যন্তই হইতে পারে। পদমর্দ্দনে লোকের প্রাণহত্যা না হয় এমন নহে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর একটি হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, সেটি হ'চ্চে মানহত্যা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা—প্রাণ; জ্যেষ্ঠ-টি চলিয়া গেলে কনিষ্ঠ-টির থাকা বিড়ম্বনা-মাত্র। যাঁহারা আমাদের কেবল প্রাণটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ধন এবং মানের প্রতি মর্ম্মভেদী কোপ-দৃষ্টির তোপ দাগিতেছেন, আমরা যদি তাঁহাদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাদের জাতি-মর্য্যাদার ভিখারী হই ও আপনাদের নিজের জাতিমর্য্যাদাকে চরণে দলিয়া ফেলি, তবে আমরা শুধু যে নীচ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করি তাহা নহে কিন্তু নীচত্বকে আমরা আমাদের কণ্ঠের হার করি, মস্তকের মুকুট করি—অঙ্গের আভরণ করি,—নীচত্বের আমরা মূল্য বাড়াইয়া তুলি, দর্প বাড়াইয়া তুলি! আমাদের দেখাদেখি লোকে সহসা মনে করিতে পারে যে, ইঁহারা এত পদমর্দ্দিত হইয়াও যখন এত পদ-লেহন করিতেছেন, তখন পদ-লেহন বোধ করি বা কোন অসাধারণ শ্রেয়স্কর মহৎকার্য্য হইবে—আমাদের বুদ্ধি অতী না কি স্থূল—তাই আমরা উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কি নীচত্বের সীমাপরিসীমা আছে? ইংরাজেরা আমাদিগকে নিগর বলে, তাহার দেখাদেখি আমরা আপনাদের জাতিকে নিগর বলি! ইংরাজেরা বাবু-উপাধিকে হেয়-জ্ঞান করে, তাহার দেখাদেখি আমরাও বাবু উপাধিকে হেয়-জ্ঞান করি! ইংরাজেরা আপনাদের দেশকে হোম্ বলে, আমরা তাহার দেখা-

দেখি তাহাদের দেশকে আমাদের হোম্ বলি! আমরা এমনি গড্ডলিকা-প্রবাহ! আমরা তো এইরূপ ভক্তিতে গদগদ হইয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট লেহন করিতেছি ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেছি। ইংরাজেরা ভিতরে ভিতরে আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখেন তাহার একটা সত্য-ঘটনা-মূলক গল্প বলি, শ্রবণ করুন।—

একজন আফিসের সাহেবের নিকট দুইজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের পিপাসার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সাহেবের নিকট জল চাহিলেন, সাহেব তখন কাচ-পাত্রের একপাত্র জল তাঁহাকে দিতে অনুমতি করিল। অনন্তর পিপাসু কর্ম্মচারীটী জলপান করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল, সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই কাচ-পাত্রটিকে ভূমিতে আছাড় মারিয়া চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। আর একজন কর্ম্মচারী যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহা দেখিয়া অবাক্, তাঁহারই মুখে আমি ঐ গল্পটি শুনিয়াছি। আমাদের প্রতি যাঁহাদের এইরূপ মনের সদ্ভাব—আমাদের এই উষ্ণদেশে যাঁহারা দোধুল্যমান শোভন ধুতি চাদর বা ইজার চাপকান পরিধান করিতে মৃত্যুকে তাহা অপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনা করেন,—এখানকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে আমরা কিনা সেই জাতির আঁটা-সাঁটা ঘোড়ার সাজ ও উত্তাপ-গ্রাসী কালো রঙের-শীত বস্ত্রের বোঝা নিকৃষ্ট জন্তুর মত বহন করিব—অথচ এক নিমিষের জন্যও লজ্জা বা ঘৃণা কাহাকে বলে তাহা জানিব না! ধিক্! কাপুরুষত্ব আর গাছে ফলে না! ছিদ্র-দর্শী তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, তবে মোজা পরিও না—ইংরাজী জুতা পরিও না, কিন্তু এ সকল তর্ক হৃদয়শূন্য বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাশ্মীরের লোকেরা শীত-দেশে কি জুতা-মোজা পরে না? ইউরোপীয় লোকেরাই কেবল যে জুতা-মোজা পরিতে জানে, আমাদের দেশের লোকেরা কস্মিন্ কালেও জানিত না

ইহা তো আর নহে ! মোঝার গঠন সকল-দেশেই সমান, সুতরাং হাইলাণ্ডরের মোঝার ন্যায় নিতান্ত চিত্র-বিচিত্রিত মোঝা না হইলে তাহাতে জাতিত্বের পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্নই বর্ত্তিতে পারে না ; আবার, মাথার ও গায়ের পরিচ্ছদে যতটা জাতি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়, পায়ের পরিচ্ছদে তাহার সিকির সিকিও হয় না।

নরমান এবং সাক্সন-দিগের মধ্যে যেরূপ জিত-জেতা সম্বন্ধ ছিল, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল। নর্ম্মানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ইংরাজদের সাকসান্ বনিয়াদ অটুট্ ছিল—মুসলমানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের হিন্দু বনিয়াদ অভগ্ন ছিল। নরম্যানেরা যেমন ইংলণ্ডকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ইংরেজ হইয়াছিল, এদেশীয় মুসল্মানেরা সেইরূপ হিন্দুস্থানকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ভারতবর্ষীয় হইয়াছিল—ধর্ম্মেই কেবল মুসল্মান ছিল,—এইজন্য মুসলমানেরা আমাদের দেশের পরিচ্ছদ-প্রভৃতি আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

মুসলমানেরা যদিও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে এদেশীয় চাপ্-কান বা চাপ্‌কানের আদি-পুরুষ (কিনা জামা-জোড়া) আদায় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতিত্ব-রক্ষার অনুরোধে বোদামের বা বন্ধনের দিক্ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এইরূপ আবার, ইংরাজ ফরাসীদের মধ্যে যদিও উইলিএম-দি-কঙ্করেরর আমল হইত আদান প্রদান চলিয়া আসি-তেছে, তথাপি ইংরাজি-ফরাসিস পরিচ্ছদের মধ্যে এখনো এমন একটু প্রভেদ রক্ষিত হইয়া থাকে যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের নিকটে কে ইংরাজ কে ফরাসিস্ তাহার পরিচয় পরিচ্ছদগুণেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ—কি ইংরাজ—কি ফরাসিস্—সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচ্ছদ দ্বারা স্ব স্ব জাতির পরিচয় প্রদান করে ; আমারাই কি কেবল এত নীচ হইব যে, চোর যেমন আপনার মুখে কালি মাখিয়া, মাথা কামাইয়া, কিম্বা পরচুলার

দাড়ি-গোঁপ করিয়া আপনার নামধাম গোপন করে, সেইরূপ আমরা এক-জাতি হইয়া আর-এক জাতির পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক জাতি-ভাঁড়ানো ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য-সন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও ব্রহ্মতেজ থাকে—কায়স্থ ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগের শরীরে একবিন্দুও ক্ষত্র তেজ থাকে, বৈশ্য-সদ্গোপের শরীরে যদি পুরুষপরম্পরাগত সৎক্রিয়ার একবিন্দুও পুণ্যফল অবশিষ্ট থাকে, শূদ্র-সন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও মহৎ-সেবার মহত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, (ইহা কথনই নহে যে, শূদ্রেরা কোন কালে স্পার্টাদেশীয় হেলট্ ছিল বা আমেরিকা দেশীয় নিগ্রো ছিল;—পুত্রেরা যেমন পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে, সেনারা যেমন সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে, লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—শূদ্রেরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই) আমি বলিতেছি যে ব্রাহ্মণ-হইতে শূদ্র-পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুজাতির শরীরে যদি একবিন্দুও পুণ্য-তেজ—মহত্ত্বের স্ফুলিঙ্গ—শৌর্য্যবীর্য্যের এক কণা—ভদ্রতার সূচ্যগ্র পরিমাণ অংশ—ইহার কোনো একটা-কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাঁহারা আপনাকে ওরূপ নীচত্বের বেশে সঙ্ সাজাইবার অভিলাষ এইদণ্ডে মন হইতে চিরকালের মতো বিদায় করিয়া দি'ন! হিমালয়কে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তুমি যত দিন মর্ত্তে বিরাজ করিতেছ, পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তোমরা যত দিন স্বর্গে বিরাজ করিতেছে, ততদিন আমরা বিপদের দারুণ মহা-প্রলয়ের মধ্যেও আমাদের স্বজাতিকে ওরূপ আত্মাপহারী চৌর্য্য-ব্যবসায় দ্বারা কলঙ্কিত করিব না; তাহার অগ্রে সমুদয় ভারতভূমির সহিত আমরা গঙ্গা-সাগরে ঝম্প প্রদান করিব—তবু আমাদের স্বজাতির জাতি-মাহাত্ম্যকে ওরূপ জঘন্য নীচত্বে—কদর্য্য কাপুরুষত্বে—পর্য্যবসিত করিব না।

যাঁহাদের কণামাত্রও চক্ষু আছে, তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের চক্ষু আনুকরণিক ধূলি-মুষ্টিতে নিতান্তই অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সোনার কাটি যদি তাঁহাদের একজনের চক্ষেও অঞ্জন-শলাকার কাজ করে, তবে তাহার জন্ম সার্থক! কিন্তু সে সৌভাগ্য যে তাহার ঘটিবে এরূপ আশা করা অতিশয় দূরে হাত বাড়ানো; তবে কি? না যাঁহাদের চক্ষুতে সবেমাত্র একটু ছানির দাগ দেখা দিয়াছে—ভরসা করি সোনার কাটির সংস্পর্শে তাঁহাদের চক্ষু একটু-না-আধটু ফুটিয়া উঠিবে; তাহাও যদি হয় তবু জানিব যে, সোনার কাটি রূপার কাটির মূল্যবান্ ধাতু-জন্ম নিতান্ত নিরর্থক নহে।

শ্রোতৃবর্গের প্রতি আমার শেষ নিবেদন এই যে, অস্ত্র-চিকিৎসা-দ্বারা দেশের চক্ষু-রোগ ভাল করিতে গিয়া অনেকের হয় তো আমি মর্ম্মে আঘাত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি নাই। এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এমন অনেক মান্য গণ্য এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লোক আছেন—তা ছাড়া আমার এমন অনেক প্রিয়-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আছেন—যাঁহাদের হৃদয়ে একবিন্দু আঘাত দিতে আমার আপনার হৃদয়ে তদপেক্ষা শতগুণ আঘাত লাগে;—ইহা দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এরূপ কার্য্যে হাত না দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত রোগ-টি যদি কেবল বর্ত্তমান রোগীর দলেই বদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আমি এ কার্য্যে হাত না দেওয়া-ই শ্রেয় বিবেচনা করিতাম; কিন্তু রোগটি যখন সংক্রামক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, তখন তাহার প্রতীকারের কোনো একটা উপায় অবলম্বন না করিয়া—ব্যথার ব্যথী কোন ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ সুস্থির থাকিতে পারে না। যদি আপনারা আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়টি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অকৃত্রিম সরল ভাবে বলিতেছি

যে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের উপর দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। আপাত-সুবিধার অনুরোধে স্বজাতিত্বের অবমানন৷ একটি মহৎ দোষ,—সেই দোষটিই আমার একমাত্র লক্ষ্য,—যেখানে যে-কোনো বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা তাহারই উপরে করিয়াছি। যদি কোন মহৎ-লোকের ঐ দোষটি থাকে, তাহা হইলেই যে তিনি মহৎ-শ্রেণী হইতে পতিত হইলেন—তাহার কোন অর্থ নাই,—কেননা "একো হি দোষো গুণ-সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" চন্দ্রের বহুসহস্র কিরণে যেমন তাহার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অনেক মহৎ গুণের আবরণে এক-টি আধ-টি দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়,—কিন্তু তা বলিয়া গুণের সংসর্গ-গুণে দোষ কিছু আর গুণ হয় না—দোষ দোষই থাকে। দোষের প্রতীকারই আমার উদ্দেশ্য—দোষাক্রান্ত ব্যক্তির গুণলাঘব আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিয়াছি—আজ প্রকাশ্যে ভ্রাতৃগণের সমক্ষে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের চির-সঞ্চিত বেদনার ভার-লাঘব করিলাম মাত্র। যাঁহারা আজ আমার হাস্যের ভিতর কিছু-মাত্র তলাইতে পারিয়াছেন—তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাস্য একটা কেবল উপলক্ষ মাত্র—গভীর হৃদয় বেদনার উচ্ছ্বাস তাহার হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে! তাহারই উত্তেজনায় আজ আমি অনেক প্রিয়-বন্ধুর মনে আঘাত দিলাম,—আঘাত না দিলে কোন কথাই আমার মুখ-দিয়া বাহির হইতে পারিত না.—কিন্তু তাঁহরা এটি জানিবেন সুনিশ্চিত যে, তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়াতে আমি আপন হস্তে আপনার মনে ততোধিক আঘাত দিয়াছি;—বহুকাল-বর্দ্ধিত হৃদয়ের বেদনা-লতাকে হৃদয় হইতে টানিয়া বাহির করা যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা আজ আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন—এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

সোনায় সোহাগা

সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, সভ্য সমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্য সমাজ নাই যাহার ষোলো আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোনো সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোনো দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনো জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্ম্মান জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নর্ম্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্‌সন্ রীতি নীতি ষোলো আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্‌সন্—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে;—যে কোন ভূত হউক্ না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা এবং অবশিষ্ট ফী-চারি ভূতের দুই আনা—একুনে চারি-দুগুণে আট আনা—এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি)। তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে

---

* ১৮০৭ শক, ১২৯৫ সাল আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্‌সন্‌ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্‌সন্‌, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন্‌, দুই আনা গ্রীক্‌ দুই আনা ফরাসিস্‌, ও দুই আনা কেল্‌ট্‌! সাক্‌সন্‌ মূল উপাদান, ইংরাজি সভ্যতার ভিত্তি-ভূমিকে এমনি বলপূর্ব্বক কাম্‌ড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক্‌ দিয়া ফরাসিস্‌ টানাটানি করিয়াছে, ধর্ম্ম যাজকের দিক্‌ দিয়া লাটিন গ্রীক্‌ টানাটানি করিয়াছে, আদিম নিবাসির দিক্‌ দিয়া কেল্‌ট্‌ টানাটানি করিয়াছে এত যে প্রাণপণ বলে—কেহই তাহাকে একচুলও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। নর্ম্মান্‌ কঙ্কে্‌সটের গ্রন্থকার ফ্রীমান্‌ বলেন—"ইলণ্ড-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মানেরা এমনি এক মারাত্মক রকমের বৈদেশিক অনুপান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্ব্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।*" অর্থাৎ সাক্‌সন্‌ মূল উপাদান কিয়ৎ কাল দমনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর-জাতীয় সভ্যতা অনুপান স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেইরূপ পঞ্চীকরণ পদ্ধতি

---

* The Norman conquest brought with it a most extensive foreign infusion, an infusion which affected our blood, our language, our laws, our arts, still it was only an infusion ; the older and stronger elements still survived, and in the long run they again made good their supremacy.

অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়,—তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্ব্বরা করিয়া তোলে; তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর কোনো জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্য-শালিনী উর্ব্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থান-টি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট্ করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র; তাহাতে—হিতে বিপরীত হয়। এড্‌ওআর্ড-দি-কন্‌ফেসর একজন সাক্‌সন্ রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার মন ছিল—সম্পূর্ণ ফরাসিস্। ফ্রীমান্ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"এড্‌ওআর্ড, সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক্, নর্ম্মাণদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ক্রটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের বা লাভের যেখানে যত কিছু বরণীয় স্থান :সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত ভরাট্ হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি যাচিয়া আনিয়াছিলেন। নর্ম্মাণদিগের কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এড্‌ওআর্ড হইতেই হইয়াছিল।"* এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওআর্ড-দি-কন্‌ফেসর্ ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই-যা একটু রক্ষা! ফ্রীমান বলেন,—"গডওয়াইন্ যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত আরম্ভোদ্যমের

*Edward did his best wittingly or un wittingly, to make the path of the Norman still easier. This he did by accustoming Englishmen to the sight of stranger enjoying every available place of honor or profit in the country. * * * * With Edward the Norman conquest really begins."

নেতা ছিলেন, তিনি যে, আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার পর নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।"* এখানে ঐতিহাসিক বৃত্যান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানো যে, আমরা, এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দেশের কোনো উপকারেই আসিতে পারিব না,—লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্‌ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তন ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্য্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথা পরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে,—তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু তাঁহার কোনো কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্য্যন্ত;—যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পা'ন, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির হৃদয় পা'ন, তবেই সোনায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজ-পুরুষদিয়গর পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোনায়

* That Godwine was the representattve of all English, feelings the he was the leader of every national movement, that he was the object of the deepest admiration of the men at least of his own earldom, is proved by the clearest of evidence.

সোহাগা করিয়া তোলে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্ত্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম,—আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্য মহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন—এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে,—জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণ-তন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল রত্ন আছে, ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল রত্ন ছিল,—কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে, আত্ম-সংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্য যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে,—কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই-আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য

সমাজ হৃদয়-শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনো একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদ্ তত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার কর্ণশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্জ্বল করিত ও দশ দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শীতল সুগন্ধ উপঢৌকন দিত,—তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী শেফালিকা নব-বারিধারায় প্রাণ পাইয়া সৌরভের মাধুর্য্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ,—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না,—কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের এক ধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধী দেশী ফুল যে, এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন্ হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না! আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ

সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বথ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ অলিব্ সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্ব্বক, যথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে; কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বথকে দূর করিয়া দেও, অথবা ষ্ট্রবেরি, পিয়ার, এবং আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একূল—ওকূল—দুকূল নষ্ট হইবে!

পুরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম-হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা-সূচক কুসংস্কার গুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল্ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া-ছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে টাইটেল্ আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না! এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করে!" ব্রহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে ঐ কথা বলিয়া-ছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য,—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট

হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব ?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ, (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য; আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের প্রেমে মজিয়া আর্য্যজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন! ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে,—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে; এরূপ যখন,—তখন উভয়-জাতির মধ্যে কোন এক জাতি যদি পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালী হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত—আর এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও লজ্জিত নহে! এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যা'ন, তাঁহারা ফলে ঠিক্ তাহার উল্টা করিয়া বসেন,—বাহ্য আকারসাম্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজ্জ্বল্যরূপে ফুটাইয়া তোলেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির সাম্য, জাতি-গৌরবের সাম্য বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্যম-উৎসাহের সাম্য-সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মতো কাজ করি;—তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাজের মতো বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, ও সহস্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধ মনুষ্য-মূর্ত্তি বিকট নেক্‌ড়েবাঘ-মূর্ত্তিতে পরিণত

হইতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্য-প্রিয় দেশ-হিতৈষী যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আর্য্য জাতীয় ভাবসাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব লাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" এক জন বাঙ্গালি ভদ্র লোক যদি নিখুঁত ষোলো আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোলো আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি—প্রসাদের কাঙ্গালি—ভাষার কাঙ্গালি—পরিচ্ছদের কাঙ্গালি—অনুগ্রহের কাঙ্গালি—এ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা,—কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ সাজিয়া, ইংরাজের দলে মিশিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জ্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়া'ন; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তি-পুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকুন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোণায় সোহাগা।

নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি

নব্য বঙ্গ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই,—যে বঙ্গ আমাদের চক্ষের সামনে দেদীপ্যমান তাহাই নব্য বঙ্গ। এ বঙ্গের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? নব্য বঙ্গ অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়ে নাই,—বায়ুর অলক্ষিত পদ-সঞ্চারে দুগ্ধে যেমন ক্রমে ক্রমে সর পড়ে, সেইরূপ কালের অলক্ষিত পদসঞ্চারে পুরাতন বঙ্গ হইতে নূতন বঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। নব্য বঙ্গের উৎপত্তি-সাধনে তাহার তিন বিভিন্ন অবয়বে তিন বিভিন্ন উপাদানের কার্য্য-কারিতা নয়ন-গোচর হয়; অন্তঃপুরের হিন্দু আচার ব্যবহারে স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের কার্য্য-কারিতা, বৈঠকখানার বাবুগিরিতে মুসলমান আদব কায়দার কার্য্যকারিতা, এবং সভাস্থলের বক্তৃতায় ও সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধে ইংরাজি বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা স্পষ্টাক্ষরে লক্ষিত হয়। হিন্দু নবদ্বীপ, মুসলমান মুরসিদাবাদ এবং ইংরাজি কলিকাতা, এই তিন স্থানের তিন সভ্যতা-স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গমের তরঙ্গ-ফেন ধীরে ধীরে জমিয়া নব্য বঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে।

* ইংরাজি আমলের অনতিপূর্ব্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্ম এবং মুরসিদাবাদের নবাবী রীতি নীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল; সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল

---

* ১৮০৭ শক, ১২৯১ সাল চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার প্রভৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়কপদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে জ্ঞানোজ্জ্বল ইংরাজি-সভ্যতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। নব্য বঙ্গ সেই বিবাহের শুভ ফল।

দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে নূতন সভ্যতার জন্ম কেবল যে এই প্রথম আমরা দেখিতেছি তাহা নহে—সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যায়। যাহাকে এখন আমরা বিশিষ্টরূপে গ্রীক সভ্যতা বলি, তাহা গ্রীকদেশের পুরাতন আর্য্য সভ্যতা এবং পুরাতন মিশর দেশের সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে প্রসূত; যাহাকে এখন আমরা রোমান্ কাথলিক ধর্ম্ম বলি, তাহা ইহুদীয় পুরাতন খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের বিবাহ হইতে প্রসূত, আর পাউল মহাপ্রভু (St Paul) এই বিবাহের ছিলেন প্রধান ঘটক। সারাসেনিক সভ্যতা এবং রোমান্ কাথলিক সভ্যতা এই দুয়ের বিবাহ হইতে ইউরোপের মধ্যমাব্দীয় সভ্যতা প্রসূত হইয়াছিল; বৌদ্ধ সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে পৌরাণিক সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দুইদিক্ হইতে দুই সভ্যতা একত্রে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে নূতন এক সভ্যতার সূত্রপাত করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—জন্ম মাত্রই বিবাহের ফল।

পুত্র সকল বিষয়ে অবিকল পিতার মত হয় না—হইয়া কাজও নাই। যদি প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম হইত যে, পুত্র অবিকল পিতার অনুরূপ হইবে তবে পৃথিবীর নগর গ্রাম হইতে বৈচিত্র্য জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিত,—

তাহা হইলে একজন মনুষ্যকে জানিলেই, তাহার বংশের সকল মনুষ্যকেই জানা হইত! তাহা যে হয় না—ইহা জগতের সৌভাগ্য। নবদ্বীপের সভ্যতা এবং মুরসিদাবাদের সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার-সেই নবদ্বীপের সভ্যতা অথবা আবার-সেই মুরসিদাবাদের সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহা হইলে তাহাতে কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোনো লাভ হইত—না মুসলমানের কোনো লাভ হইত। তেমনি আবার নবাবি হিন্দু সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার-সেই নবাবী হিন্দু সভ্যতা অথবা আবার-সেই ইংরাজি সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত তাহাতেই বা কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোনো লাভ হইত না ইংরাজের কোনো লাভ হইত। তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনো তাহাই থাকিত, নূতন কিছুই হইত না।

নবাবি হিন্দুসভ্যতার সহিত ইংরাজি সভ্যতার বিবাহের সুফল হাতে হাতে ফলিতেছে;—মুসলমান সভ্যতার পরাক্রমে বঙ্গের পুরাতন আর্য্য-সভ্যতা ক্রমশই হীন-জ্যোতি হইয়া পড়িতেছিল—ইংরাজদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির আলোকে প্রাণ পাইয়া এক্ষণে তাহা আবার মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। প্রাচীন লোকেরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে "হিন্দুয়ানি আর থাকে কদাচ!" ইঁহারা শুধু বোঝেন—দেশাচার রক্ষা করাই হিন্দুয়ানি! কোনো হিন্দুশাস্ত্রে লেখে না যে, অন্তঃপুরের বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের পদার্পণ নিষেধ,—বরং ইহার অবিকল বিপরীত; হিন্দুশাস্ত্রে আছে "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা" ছায়ার ন্যায় স্ত্রী স্বামীর অনুগতা হইবেন,—বোম্বায়ের হিন্দুরা সপরিবারে লোকালয়ে যাতায়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। পর্দানষীন্ শব্দটাই মুসলমানী শব্দ। স্ত্রীদিগকে সাধারণতঃ মাতৃ-সম্বোধন করাই হিন্দুদিগের চিরকালের

অভ্যাস,—এখন যদি তাহার কোনো ব্যত্যয় হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা পরাধীনতার ফল। পুত্রের সমক্ষে মাতা যেমন অসংকোচে বাহির হইতে পারে, হিন্দু-স্ত্রী সেইরূপ রীতিমত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া ভদ্রসমাজে অসংকোচে বাহির হইতে পারেন,—তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি ইংরাজি বল্লভাচার (gallantry) ফলাইতে যায়, সে জাতিতে হিন্দু হইলেও তাহার মন কিরিঙ্গির অধম,—এই শ্রেণীর কদর্য্য কাপুরুষ লোকদিগের প্রতি একজন সুবিজ্ঞ রাজার এইরূপ অভিসম্পাত দেওয়া আছে Honi soit qui maly pense যে মন্দ ভাবে তাহার মন্দ হউক্। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগকে শক্তাশক্তি করিয়া ঘরে চাবি দিয়া রাখিবার রীতি নাই কেন? দিল্লীর প্রতাপ সে সকল স্থানে পূর্ণতেজে পৌছিতে পারে নাই—এই তাহার একমাত্র কারণ।

রামমোহন রায়ের দূর-দর্শিতাকে ধন্য—তিনি একাকী আপন বুদ্ধি-প্রভাবে নব্য-বঙ্গের উন্নতির জটিল সমস্যা অবলীলা-ক্রমে পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নব্য-বঙ্গের জন্মদান করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাহার সঙ্গে তিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মূল-পত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে স্থিতি এবং গতি কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

গতি, কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই; প্রত্যহই লোকেরা রৌদ্র-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়-ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবস্থান করে, কাহারো শরীরে বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখন সমস্তই উল্‌টিয়া যায়; পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে; পূর্ব্বে জল সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে; এককালে আর এক-কালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীত কাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস-

গুণে শীত-বস্ত্র পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এত কাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোনো অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক সমাজেরও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একরত্তি নামে নির্দ্দেশ: করিতেছি। কিন্তু আর একদিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত-কালোচিত বস্ত্র-পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্মকালে পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও গ্রীষ্মকালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীতকালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোনো কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না—সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে সে কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে সে কথা শীতকালে খাটে না; কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপ-যোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে সে কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালেও তেমনি খাটে, কোন কালেই তাহা উল্টায়: না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাই-তেছে—প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম,—শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটি যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না; দ্বিতীয়, সার্ব্বকালিক নিয়ম,—স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে—এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজের যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে-গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্বই সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল, এবং যে গুলি যাথাকালিক তাহার কালো-চিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্তি-মূল।

রামমোহন রায় বঙ্গের গতি ভাল'র দিকে ফিরাইবার জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে ইহা অনিবার্য্য কেবল নয়,—ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যাথাকালিক রীতি-নীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া আমরা যেন সেই সঙ্গে সার্ব্ব-কালিক ধর্ম্ম-নিয়মের স্থৈর্য্য বিনাশ না করি—এই বিষয়ে আমাদের সবিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াই স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারিতেন যে, একা একজন সমাজ-সংস্কারকের যত্ন ও পরিশ্রমে এই যা হইল ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে এই বঙ্গ সমাজের কি দারুণ দুর্দ্দশা হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! তাহা হইলে ছত্রাবরণ-শূন্য ইংরাজি কিরণে বঙ্গ-সমাজের মাথা এরূপ ঘুরিয়া যাইত যে, বঙ্গ সমাজ অচিরে ভ্রমান্ধ খ্রীষ্টান এবং জ্ঞানাভিমানী নাস্তিক এই দুই সম্প্র-দায়ের অন্ধকারময় জটল্লার আড্ডা হইত। তাহা হইলে বাঙ্গালিরা আসল কাজে যাহাই হউক্ না—বাহ্য আকারে ইংরাজ অপেক্ষাও ইংরাজ হইয়া উঠিত; বাঙ্গালি সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা দুয়ের সম্মিলনের ফলস্বরূপ আর যে কোন প্রকার নূতন সভ্যতা উৎপন্ন হইবে তাহার পথ বন্ধ হইয়া যাইত। মুসলমানদিগের আমলে বঙ্গদেশে যেরূপ পারস্য ভাষার অনুশীলন প্রচলিত ছিল, তাহাতে লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে পারে এমন কোন অঞ্জন ছিল না; এই জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মুসলমানদিগের আদব-কায়দা এবং স্বদেশের পুরাণতন্ত্র এ দুয়ের মিলন-মিশ্রনের পক্ষে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যার অনুশীলন সহসা যেরূপ লোকের স্বাধীন

চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তোলে, তাহাতে সে অনুশীলনের সঙ্গে সমগ্র 'পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম কোন গতিকেই মিশ-খাইতে পারে না,—ঐ দুই বিরোধী সামগ্রীকে বল পূর্ব্বক মিশাইতে গেলে তেলে-জলে মিশানো হয় মাত্র। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বতন কালে বঙ্গের স্থিতির ভিত্তিমূল ছিল—এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যার তোড়ের মুখে তাহা কোন ক্রমেই টেঁকিতে পারে না,—এখন বঙ্গের স্থিতির এইরূপ একটা নূতন ভিত্তিমূল আবশ্যক যাহা ইংরাজি বিদ্যার উন্নতি-স্রোতে না টলিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিতে পারে।

পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে স্থিতির কিছু অতিমাত্রা বাড়াবাড়ি ছিল। আপাদ-মস্তক শৃঙ্খলা-বন্ধনে হিন্দুসমাজ জড়-আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার কর্ত্তব্য, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাচিত ও অলঙ্ঘ্য গণ্ডি দিয়া সীমাবদ্ধ করা ছিল। মনুর আমলের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলা হিন্দুসমাজের এরূপ অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে, এখনকার এই ঘুমন্ত হিন্দুসমাজও ঘুমের ঘোরে সেই একই বাঁধা রাস্তায় একই বাঁধা চালে চলিতেছে। কামারের কাজ কামার করিতেছে, কুমোরের কাজ কুমোর করিতেছে, তাঁতির কাজ তাঁতি করিতেছে, চাসার কাজ চাসা করিতেছে,—তা'ই না হয় নূতন প্রণালীতে করুক, তাহাও না,—মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ কার্য্য-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে আজিও সেই প্রণালীতে সকলে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। স্থিতির যেখানে এইরূপ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানে গতি সহজেই মন্দা পড়িয়া আসে—ইহাই সমাজের নাড়ী-ত্যাগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। স্থাবর স্থিতি-শীলেরা বলিবেন সন্দেহ নাই যে, "চাসা দিব্য চাস করিতেছে, পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেছে, রাজা রাজ-কার্য্য করিতেছে, অন্ন-প্রাসন বিবাহ শ্রাদ্ধ যথা নিয়মে

চলিতেছে, সকলই দিব্য নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল আর কি আশা করা যাইতে পারে? তবে কেন মিথ্যা একটা পরিবর্ত্তনের বিপ্লব আনিয়া শুধু শুধু সমাজের শান্তি-ভঙ্গ করা!" অন্ধ-সংস্কার দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে।" কিন্তু সত্য-সত্যই কি সমাজ দিব্য চলিতেছে? গতিহীন স্থিতিশীল সমাজের উপরে জ্ঞানের এক-বিন্দু আলোক পড়িলেই তাহার দিব্যত্ব ঘুচিয়া যায়। এরূপ সমাজের নীচের লোকেরা

কাঁপে সদা কর-যোড়ে, দিবা নিশি গ্রীবা অবনত।
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত॥

স্বপ্ন প্রয়াণ।

উপরের লোকদিগের—
গর্ব্ব অভিমান ওঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি,
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি॥

ঐ।

এরূপ স্থিতি-শীল সমাজের নীচের লোকদিগের উপরে-উঠিবার সিঁড়ি নাই, উপরের লোকদিগের নীচের সাহায্যে নামিবার সিঁড়ি নাই। স্থিতিশীল সমাজের উপর-শ্রেণীর লোকেরা বিনা যত্নে বিনা পরিশ্রমে শুদ্ধ কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃপায় সমাজের উচ্চ আসনে অধিকার পাইয়াছেন—তাঁহারা প্রাণ থাকিতে সে আসন যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দিতে পারেন না; তাঁহারা চাহেন "সমাজ যেমন আছে তেমনি থা'ক্"। তাঁহারা মনে জানেন যে, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকিলেই তাঁহারাও যেখানে আছেন সেইখানে থাকিবেন—সমাজের মস্তকের উপরে থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা মুখে এইরূপ কারণ দর্শান যে, "পুরুষানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না।" যাঁহাদের

"স্থিত" আছে—অর্থাৎ ধন-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে—স্থিতিশীল সমাজ তাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ ; এই সব দুর্গপতির—

"চাবি-বন্ধ হৃদয় পাষাণময়, দৃঢ়-মুষ্টি কর।
পদ প্রসারিতে মানা, চারিদিকে গণ্ডি আঁকা ঘর।"

নূতন উপার্জ্জনের কষ্ট স্বীকার করিতে ইঁহারা সম্মত নহেন—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের শ্রমার্জ্জিত ধন-মান রক্ষা করাই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য, এবং যাহা আছে তাহা হারাইবার ভয়ই ইঁহাদের প্রধান ভয়। গতিশীল সমাজে নূতন উপার্জ্জনের সহস্র পথ নিরন্তর খোলা থাকে, ও সহস্র ব্যক্তি উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত অভীষ্ট পথে চলিয়া অভীষ্ট ফললাভ করে ; স্থিতিশীল সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত। এ সমাজে ধন-মান যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরই আছে, আর সমস্ত লোকে অতি দীনহীনভাবে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনোরূপে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করে। স্থিতিশীল সমাজ যাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থের অনুরোধে বলিতে পারেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে," এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও উপরি-উক্ত কথায় মাথা নোয়াইতে পারে—কিন্তু অপক্ষপাতী জ্ঞান কখনই ওরূপ কথায় সায় দিতে পারে না। জ্ঞান স্পষ্টই বলিবে যে, "এ সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে গতির তাড়িত-সঞ্চার করিতে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করা উচিত হয় না।" কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক্ না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরো অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া থাকে। সমাজের এইরূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোনো নূতন উপকরণ তাহার

উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে ; প্রথম প্রথম নূতন-কিছুই শরীরে পরিপাক পায় না,—ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়। প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভুত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতনগুলা পুরাতনের অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের উপরে নূতনের আসন জমিতে না জমিতে যদি আর এক নূতন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এবং দ্বিতীয় নূতনের আসন জমিতে না-জমিতে তৃতীয় নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন-নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই-দিনের নাবালক স্থিতিকে বৎসর-কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন-নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

নব্য-বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতি গতিকে রোধ করিবে না, উভয়ের মধ্য-পথ দিয়া বঙ্গ সমাজ'কে উন্নতি-মঞ্চে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা এ যাবৎ-কাল বঙ্গ সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল ছিল তাহা এক্ষণকার কালোচিত গতির উপযোগী নহে। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যানুশীলন নব্য-বঙ্গকে স্বাধীনতার উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে,—"আপনার স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ ভিন্ন আর কাহারো কথা মানিব না" এই মহামন্ত্রে কৃতবিদ্য বঙ্গ-সমাজকে দীক্ষিত করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসন নব্য-বঙ্গের এই নবোদ্দীপ্ত স্বাধীনতা-

স্পৃহাকে কিছুতেই বাঁধ দিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিতেছে না—পারিবেও না। এই স্বাধীনতা-স্পৃহাকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া নিতান্তই হীন বুদ্ধির কার্য্য ; উল্টা আরো, যাহাতে উহা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে তাহার উপায় অন্বেষণ করা কৃতবিদ্য লোকের কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতার উপর্য্যুপরি তিনটি ধাপ আছে,—প্রথম, স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি ; দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্তা দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়মের সংস্থাপন ; তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত সেই সকল ধর্ম্মনিয়ম দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করা,—এক কথায় ধর্ম্মনিয়মানুসারে চলা।

প্রথম, স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি। স্বাধীনতা আপনার নূতন স্ফূর্ত্তির প্রথম উদ্যমে অধীরে বলিয়া উঠে "আমি কাহারো বলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিব না, আমার নিজের স্বাধীন চিন্তা যাহা বলিবে তাহাই করিব।" কিন্তু স্বাধীনতা এখনও বালক—এখনো তাহার চিন্তা-শক্তি জন্মে নাই ; এ দুর্দ্দান্ত বালক-স্বাধীনতার উপর সমাজ কিছুতেই নির্ভর করিতে পারে না ; এ স্বাধীনতা গতির উত্তেজনায় প্রমত্ত হইয়া সমাজের স্থিতিকে ভঙ্গ করিতে সর্ব্বদা গদাহস্ত। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অধিক উপরে উঠিতে পারে না।

দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্তা হইতে সার্ব্বভৌমিক নিয়মের উৎপত্তি। স্বাধীনতা যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেয় যে, "তুমি যখন স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিয়াছ তখন তাহার চরম পর্য্যন্ত যাও—মধ্য-গঙ্গায় হাল ছাড়িয়া দিও না ; তোমার স্বাধীন চিন্তা যে পর্য্যন্ত না সার্ব্বভৌমিক সত্যে পৌঁছায় সে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি মানিও না ; যতক্ষণ না সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-জনক ধর্ম্মনিয়ম অন্বেষণ করিয়া পাও, ততক্ষণ আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিও না।" এইবার স্বাধীনতার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে ; স্বাধীনতা বুঝিয়াছে যে, শুধু-গতিতে কিছুই হয় না—

গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি চাই ; বুঝিয়াছে যে, পরিবর্ত্তনীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা যেমন আবশ্যক, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম-নিয়মকে ধরিয়া থাকা তেমনি আবশ্যক ; কিন্তু সেই যে ধর্ম্ম-নিয়ম তাহা ঐ স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত—পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা বচন মাত্র নহে।

তৃতীয়, আপনার স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্ম-নিয়মে আপনি চলা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা এ-যাবৎকাল ক্রমাগতই বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বলের অধীনে ঘাড় পাতিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মনু বলিয়াছেন অমুক কার্য্য করা কর্ত্তব্য অতএব তাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম মনুর শাসনাধীন ; গুরুর আজ্ঞা পালনই সার ধর্ম্ম—ধর্ম্ম গুরুর শাসনাধীন। কুন্তী যখন পাণ্ডবদিগকে বলিলেন "তোমরা পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বাঁটিয়া লও" তখন সেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আদেশ পালন করাই পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম হইল। দেবতারা বলবান্ বলিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও দোষের নহে—তেজীয়সাং ন দোষায়। এখনকার জ্ঞানোজ্জ্বল সমাজে মনুর শাসন বা গুরু-আজ্ঞা, কিংবা ঋষিবাক্য, ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ দেখিতে হয়। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের নিয়ম কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা হইতে প্রসূত হইলে তবেই তাহা লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। প্রতি জনেই আপনার স্বাধীন চিন্তা হইতে ধর্ম্মের নিয়ম উদ্ভাবন করিবার অধিকারী। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির দোষে যে-সে নিয়ম ধর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিবে না ; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। কেননা নির্দ্ধারিত নিয়মটি সত্য-সত্যই ধর্ম্মের নিয়ম কি না তাহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পারে। যদি সে নিয়ম সার্ব্বভৌমিক পদবীর উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি তাহা সর্ব্ব-

সাধারণে প্রচারোপযোগী হয়, তবেই তাহা ধর্ম্ম-নিয়ম—নচেৎ নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি ;—"মিথ্যা কথা কহিবে" এই নিয়ম সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী না "সত্য কথা কহিবে" এই নিয়ম সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী ? যদি কোনো রাজা স্বীয় রাজ্যে এইরূপ একটী নিয়ম প্রচলিত করেন যে "কেহই মিথ্যা ছাড়া সত্য কহিবে না," তাহা হইলে সকলেই সকলের কথা অবিশ্বাস করিবে, কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত করিবে না ; কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিলে কোনো কথা কহিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে না—সমস্ত রাজ্যে কথা কহা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে ; তাহার সঙ্গে মিথ্যা কহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, "মিথ্যা কহিবে" এ নিয়মটি যদি কোনো কালে সর্ব্ব-সাধারণে প্রচলিত হয়, তবে আত্ম-হত্যা তাহার ললাটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই প্রকার শুভবুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে শ্রেয়ঃ-পথের সন্ধান পাইয়া আমার নিজের স্বাধীন-চিন্তা আমাকে বলিতেছে যে, সত্য কহিবে এই নিয়মটিই সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী—সুতরাং আমি যদি সত্যের নিয়মে চলি তবে আমি আমার আপনারই স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ অনুসারে চলি—কাহারো কোনো বল দ্বারা বাধ্য হইয়া চলি না।

স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তিতেই জ্ঞানের উৎপত্তি সাধিত হয় ; স্বাধীন চিন্তার ফলে—এক দিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-এক দিকে ধর্ম্ম-নিয়ম এই দুই প্রকার নিয়মের আবিষ্কারে—জ্ঞানের স্থিতি সাধিত হয় ; এবং স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত সেই সকল নিয়মকে নানা প্রকার হিত-কার্য্যে প্রয়োগ করা হইলেই জ্ঞানের গতি সাধিত হয়। জ্ঞানের এইরূপ উৎপত্তি স্থিতি এবং গতির উপরে সভ্যতার উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। বৈদিক মুনিঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি-প্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছিল—এবং তাহার পর মন্বাদি রাজর্ষির অবিস্কৃত ধর্ম্মনিয়মে

আমাদের দেশে জ্ঞানের স্থিতি সাবধানে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো দেশেই জ্ঞানের গতি রীতিমত সাধিত হইতে পারে না—অর্থাৎ জ্ঞানকে রীতিমত কার্য্যক্ষেত্রে নাবানো যাইতে পারে না। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের দেশে জ্যোতিষ ছিল—কিন্তু নাবিকীয় কার্য্যে জ্যোতিষের প্রয়োগ ছিল না; আমাদের দেশে গণিত-বিদ্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্র-তন্ত্রে গণিতের প্রয়োগ ছিল না; আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিল কিন্তু সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগ ছিল না;—আমাদের সমাজে স্থিতির পীড়ন-ভারে গতির শ্বাস অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, স্থিতি এবং গতি, দুইই সমান আবশ্যক; এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, আমাদের দেশে স্থিতির কোনো উপাদানেরই অভাব নাই—আমাদের যত কিছু অভাব সমস্তই গতির প্রসঙ্গাধীন। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা আমাদের স্বদেশীয় স্থিতির সহিত ইউরোপীয় গতি মিশ্রিত করিয়া সেই মৃতপ্রায় স্থিতির জীবন সঞ্চার করি। ইংরাজি-বিদ্যালয় জ্ঞানের কিরণ-বর্ষণে দিন দিন নব্যবঙ্গের ভাব-ভঙ্গি পরিবর্ত্তন করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু যতই কেন পরিবর্ত্তন করুক্ না—ব্রাহ্মসমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোনো অবস্থাতেই নব্যবঙ্গ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না; স্বাধীন-চিন্তার নূতন স্ফুর্ত্তি কিয়ৎ পরিমাণে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে—ইহা তো হইতেই পারে, কোন্ ভাল বস্তুর সঙ্গে মন্দ একটু-না-একটু লাগিয়া না থাকে? কিন্তু সেই স্বাধীন চিন্তার স্ফুর্ত্তি হইতেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম উদ্বোধিত হইয়া স্বাধীনতাকে যথার্থপথে পরিচালনা করিবে—ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। কালোচিত পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য যেমন আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়

ধর্ম্ম-নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নব্য-বঙ্গসমাজের গতির ভিত্তি-মূল, আর একটি স্থিতির ভিত্তিমূল। আমাদের স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইংরাজি বিদ্যার বিবাহ সংঘটন হইলে সেই সঙ্গে স্থিতি এবং গতির বিবাহ-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়; ইহাই নব্যবঙ্গের মঙ্গলের একমাত্র নিদান।

আমাদের দেশের নব্যসম্প্রদায়েরা একটি বিষয়ে বড়ই ভুল বোঝেন। স্বাধীন-চিন্তা বলিতে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তাই বোঝেন—দেশের স্বাধীন-চিন্তা বলিয়া যে একটা সামগ্রী আছে তাহা তাঁহারা বোঝেন না। যেমন আমি তুমি তিনি, তেমনি আমার দেশ তোমার দেশ তাঁহার দেশ। দেশের স্বাধীন অবস্থায় দেশের মস্তক-স্বরূপ ব্যক্তিদিগের মন হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ সত্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা বিনিঃসৃত হয় তাহাই দেশের স্বাধীন-চিন্তা। স্বভাবত যেরূপ চিন্তা বিনিসৃত হয়—অর্থাৎ কোনো বিদেশীয় জাতি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাধিত না হইয়া যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়। প্রথমে প্রেম আসিয়া স্বাধীনচিন্তাকে উস্কাইয়া দিবে, তাহার পর জ্ঞান আসিয়া স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবে, এই হ'চ্চে নিয়ম। যদি আমার প্রেম না থাকে তবে আমার স্বাধীন চিন্তাই বা কিসের জন্য—স্বাধীনতাই বা কিসের জন্য! যে জাতির স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম আছে সেই জাতিই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রেমের উত্তেজনায় প্রথমে স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয়; সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়, অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই-সকল নিয়ম দ্বারা স্বাধীনতা কার্য্যে নিয়মিত হয়। এইরূপে আমার স্বাধীন চিন্তা হইতে যে ধর্ম্ম প্রসূত হয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে আমার স্বধর্ম্ম—আর এক জনের মতানুযায়ী ধর্ম্ম যদি আমার স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয় তবে তাহা আমার স্বধর্ম্ম নহে—তাহা পরধর্ম্ম।

স্বদেশের সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথাটি পুনরুক্তি করা যাইতে পারে, বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় স্বদেশে স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয়, সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় স্বদেশের জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়; অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই সকল নিয়ম দ্বারা স্বদেশের স্বাধীনতা পৈতৃভূমিক কার্য্যে নিয়মিত হয়। এইরূপ স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্মই স্বদেশের স্বধর্ম্ম; আর এক জাতির নিকট হইতে শেখা ধর্ম্ম যদি স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয়, তবে তাহা স্বদেশের স্বধর্ম্ম নহে কিন্তু পরধর্ম্ম। ভগবদ্গীতায় আছে "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আপনার স্বাধীনচিন্তার বিরোধী—যে ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক লোকের স্কন্ধে বা দেশের স্কন্ধে আরোপিত হয় তাহা ভয়াবহ। প্রেম যেমন স্বাধীনচিন্তাকে উস্কাইয়া দেয়, বল তেমনি স্বাধীন চিন্তাকে দমাইয়া দেয়। পুরাকালে সামাজিক শাসনবলে আমাদের দেশের স্বাধীনচিন্তা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আর, সেইজন্য, চিন্তাশীল মুনি-ঋষিরা এক প্রকার আরণ্যক-সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্তার সে ভয় নাই, কিন্তু তাহার স্থানে আর এক গুরুতর ভয়ের পূর্ব্ব-সূচনা দেখা দিতেছে। ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল বিদ্যার মোট বহাইয়া না ছাড়ে—এই সে ভয়। এক পয়সা ফেলিয়া দিলেই মুটে মোট মাথায় করে—ইংরাজেরা আমাদের তৃষিত চক্ষের সম্মুখে কেরানি-গিরি নিক্ষেপ করিলেই আমরা বিদ্যার বোঝায় ঘাড় পাতিয়া দিই।

ইউরোপীয় লোকেরা যে আপনাদের স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতে আপনাদের সমস্ত বিদ্যা উদ্বোধন করিয়া তুলিয়াছে—এবং তাহাদের সেই স্বাধীন-চিন্তাটির মূল্য যে তাহাদের সমস্ত বিদ্যার মূল্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভুল-ক্রমেও আমরা সে দিক্‌পানে চাহিয়া দেখি না। ইউরোপীয় সমস্ত বিদ্যা যদি অটুট থাকে—ও কেবল যদি স্বাধীন-চিন্তাটুকু তাহার গাত্র

হইতে খসিয়া যায়—তবে ইউরোপীয় বিদ্যার মূল্য একেবারেই স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হয়! তাহা হইলে আর যে নূতন কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে তাহার পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি পুঁথির যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভিন্ন—আপনাদের স্বদেশোচিত স্বাধীন-চিন্তা হইতে জ্ঞানালোকের উদ্দীপন আমাদের নব্যশাস্ত্রে লেখে না বলিলেই হয়। পূর্ব্বে আমরা বলিতাম 'মনু বলিয়াছে অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য অতএব তাহা কর্ত্তব্য,' এখন আমরা বলিতেছি 'ইরাজি মতে অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য—অতএব তাহা কর্ত্তব্য।' পূর্ব্বে মনুর স্বদেশানুরাগ-মিশ্রিত আধ্যাত্মিক বলের অধীনে আমরা গ্রীবা নত করিতাম, এখন ইংলণ্ডের গর্ব্বস্ফীত পার্থিব বলের অধীনে আমরা গ্রীবা নত করিতেছি! —স্বাধীন-চিন্তা পূর্ব্বে আমাদের দেশে নব্য-ইউরোপের মত এতটা প্রবল ছিল না এই মাত্র—কিন্তু এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্তা নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে অন্ততঃ আরণ্যক মুনি-ঋষিদের মধ্যে স্বাধীন-চিন্তা মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল;—এখন একদিকে ইউরোপীয় পরাক্রমের গুরুভার এবং আর একদিকে ভ্রষ্ট হিন্দুয়ানি-রূপী মৃত ঘটোৎকচের গুরুভার—দুইদিক্ দিয়া দুইভার আসিয়া আমাদের দেশের স্বাধীন-চিন্তাকে যাঁতায় পিসিয়া বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই উভয়-সঙ্কট হইতে আমরা নব্য সমাজকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র মনুর বিধান এখনকার কালোচিত নহে, এ জন্য এখন আমরা তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না; ইউরোপের সমগ্র সামাজিক রীতিনীতি আমাদের দেশোচিত নহে—এজন্য তাহাও আমরা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য আমাদের এই যে, এ-দেশের স্বাধীন-চিন্তায় ইউরোপের যে সমস্ত রীতি নীতি এ দেশের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব; আবার এ-কালের স্বাধীন

চিন্তায়—মনুপ্রভৃতি স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের যে সমস্ত বিধান বর্ত্তমান-কালের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাও আমরা অসংস্কোচে গ্রহণ করিব। ইংরাজেরাও আর্য্যজাতি—আমরাও আর্য্যজাতি,—ইংরাজদিগের সহিত আমাদের এক প্রকার জ্ঞাতি সম্পর্ক; ইংরাজদিগের মধ্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহা এক সময়ে আমাদের মধ্যেও ছিল—মুসলমানদিগের রাজ্যকালে সেরূপ অনেক সামগ্রী আমরা অযত্নে হারাইয়া ফেলিয়াছি,—ইংরাজদের সান্নিধ্য-বশতঃ যদি সে-গুলি পুনরায় নূতন বেশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে সুযোগ পায়—তবে তেমন সুযোগ কোন মতেই আমাদের ছাড়া উচিত হয় না। ইউরোপের নিকট হইতে আমাদের স্বদেশোপযোগী সভ্যতার উপকরণ গ্রহণ করিবার বৈধ প্রণালী সবিস্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার এ সময় নহে—এখানে তাহার দুই একটি স্বল্প আভাস প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। কাণ্টের দর্শন-শাস্ত্র এবং আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্র দুয়ের মধ্য হইতে সার-মন্থন করিয়া লইলে সে দুই সারাংশের কেবল যে পরস্পর মিল খায় তাহা নহে, কিন্তু উভয়ের দোষাংশ উভয়-কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং উভয়ের গুণাংশ উভয়ের যোগে সংবর্দ্ধিত হইয়া নূতন এক সারবান্ দর্শন-শাস্ত্র আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশের পারদ-ভস্মাদির নানাবিধ রাসায়নিক প্রকরণ ইংরাজি কিমীয় বিদ্যার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নূতন এক রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি ঘটাইতে পারে। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে ঐরূপ মিলনের কথা আরো জোরের সহিত খাটে। লৌকিক শিষ্টাচার-প্রথাও এমন অনেক পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ আর্য্যজাতির মধ্যে এককালে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এখন বঙ্গ-দেশ হইতে তাহার অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে; নব্যবঙ্গে তাহার পুনরুদ্দীপন ভাল বই মন্দ নহে। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত—হস্ত-আলোড়ন-রূপ অভিনন্দনের প্রথা;—এপ্রথা হিন্দুস্থানি খোট্টা

মহলে এখনো প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় অভিনন্দন-প্রথা এবং ভারতবর্ষীয় অভিনন্দন-প্রথা দুয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, দুই হস্তে দুই হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ভারতবর্ষীয় প্রথা—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ইউরোপীয় প্রথা—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কালিদাসের সময় বোধ হয় আমাদের দেশে ইউরোপের অনুরূপ অভিনন্দন-প্রথা প্রচলিত ছিল;—পুরুরবা রাজার সহিত চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎকারের সময়, রাজা রথ হইতে নামিয়া বলিলেন "স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে," ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ Welcome dear friend; ইহার পরেই লিখিত আছে "অন্যোন্যং হস্তং স্পৃশতঃ" উভয়ে পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিলেন; হস্ত এখানে দ্বিবচন নহে কিন্তু একবচন—ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কালিদাসের সময়ের অভিনন্দন-প্রথা এক্ষণকার ইউরোপীয় প্রথার অনুরূপ ছিল। এইরূপ যেখানে আমাদের দেশের রীতি-নীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন আমাদের স্বদেশেরই পূর্ব্বতন রীতি-নীতি উস্কাইয়া তুলে, সেখানে সেরূপ পরিবর্ত্তনকে মিছামিছি স্বদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবিয়া কেন যে আমরা ভয় করিব তাহার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশ স্বাধীন অবস্থায় যেরূপ ছিল তাহা আমরা হারাইয়াছি,—এক্ষণকার কোনো কালোচিত পরিবর্ত্তন যদি সেই হারা সামগ্রী আমাদিগকে মিলাইয়া দেয়, তবে উল্টা আরো তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করা আমাদিগকে শোভা পায়। ইউরোপীয় আধুনিক আর্য্য রীতিনীতি যদি আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্য রীতি-নীতিকে ভস্মের আচ্ছাদন হইতে টানিয়া বাহির করে, তবে নূতন পুরাতনের মধ্যে—গতি এবং স্থিতির মধ্যে—সহজেই ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়,—ইহা কত না প্রার্থনীয়।

এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতি-নীতি আচার ব্যবহার—যাহা থাকিলেও

বিশেষ কোন লাভ নাই—না থাকিলেও বিশেষ কোন হানি নাই, তাহার কথা এখন যাইতে দিয়া—স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা প্রসূত ধর্ম্ম-নিয়ম সকল কালোচিত গতির সহিত কিরূপে সৌহার্দ্দপাশে বদ্ধ হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যা'ক। আমাদের দেশের বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র হইতে যদি এরূপ এক উচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, যাহা বর্ত্তমান কালের উন্নত জ্ঞানের উপযোগী, তবে তাহাই নব্য-বঙ্গের স্থিতি-বন্ধন-কার্য্যে যথার্থ অধিকারী। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের মথিত সারাংশ—যাহার আর-এক নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাহা একদিকে যেমন স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত—আর একদিকে তেমনি বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত জ্ঞানের সবিশেষ উপযোগী,—এক দিকে যেমন তাহা নব্য-বঙ্গের স্থিতি-সংস্থাপনের উপযোগী আর এক দিকে তেমনি তাহা নব্য-বঙ্গের গতির অবিরোধী,—ঈশ্বরকৃপায় যেটি আমাদের চাই সেইটি আমরা ঠিক্ সময়ে পাইয়াছি—এজন্য তাহার প্রতি সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

স্থাবর স্থিতিশীলতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশের শোচনীয় জড়-ভাব রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয়কে কত যে তীব্র বেদনায় ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আর কোন ব্যক্তি হইলে—যাহাতে বঙ্গের স্থিতি ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় তাহারই চেষ্টায় তিনি আপনার জীবন উৎকর্ষ করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের হৃদয় যেমন বিশাল ছিল তাঁহার বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল—একাধারে প্রেম এবং জ্ঞানের সমান উৎসর্গ যদি কোথাও দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহা রামমোহন রায়েই দেখা যায়। রামমোহন রায়ের কার্য্য দেখিলেই তাঁহার মনের মহদ্‌ভাব দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; সে ভাব এই যে, বঙ্গ সমাজের স্থিতি-ভঙ্গ না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে গতির সঞ্চার করিতে হইবে। তিনি দেখিলেন ইংরাজি বিদ্যালয় ভিন্ন গতি-সঞ্চারের উপায় নাই, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন

স্থিতি-রক্ষার উপায় নাই ; এই জন্য তিনি সমাজরূপী তুলাদণ্ডের এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং আর-এক দিকে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ; যদি একটিকে উঠাইয়া লও তবে আর একটি নিম্নে ঝুঁকিয়া তদ্দণ্ডেই ধূলিসাৎ হইবে ! রামমোহন রায়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানদর্শী ত্রিনেত্রে নব্য বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি তিনই সাক্ষাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং তাঁহার একা হস্ত তিনেরই নির্ব্বাহ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। নব্য-বঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরাজি এবং বাঙ্গালি সভ্যতার বিবাহ—স্থিতির মূল ব্রাহ্মসমাজ—গতির মূল ইংরাজি বিদ্যালয়,—রামমোহন রায় এই-তিনটি আপনার অটল কীর্ত্তি-স্তম্ভ এবং নব্যবঙ্গের অটল আশ্রয়-স্তম্ভ একাধারে সংস্থাপন করিয়া পৃথিবীর একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন ; ভবিষ্যতে ইহার শুভ-ফল যে কত দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া পড়িবে, এখন আমরা তাহার বাষ্পও হয় তো জানি না।

আর্য্যামি এবং সাহেবি আনা

আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তন হয় নাই সেই মান্ধাতারও পূর্ব্বের আমলে একটি নবাভ্যাগত পরাক্রমশালী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং ভারত-বর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতি-ভেদের সবে-মাত্র গোড়াপত্তন আরম্ভ হইয়াছে সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্য্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন-বর্ণ সম্বলিত একটা জেতৃজাতি বুঝাইত এবং শূদ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত দস্যুগণ বুঝাইত। এই প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিকে যদি একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা যায় তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি বৈশ্য; কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগে সে মৎস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানি মাত্র অর্থাৎ একা কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাও না থাকারই মধ্যে; কেন না, কাল-রাক্ষস কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—বিশেষতঃ অমন একটা শাঁসালো সামগ্রীকে! বলিব কি—নিদারুণ

* ১৩৯৭ সালে চৈতন্য লাইব্রেরী সভার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্যের দশযোজন-ব্যাপী মুড়াখানির ভিতর হইতে সমস্ত রস-কস শুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে—তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট রাখে নাই! ফলেও তাই দেখা যায় যে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মস্তকের উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর-অঞ্চলে শাস্ত্র-চিন্তার পরিবর্ত্তে অন্নচিন্তা বলবতী! এক্ষণকার ব্রাহ্মণও যেমন তাঁহার উপনয়নের শ্রীও তেমনি! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী কোথায় বারো বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন—তাহা না করিয়া তিন দিবস কারাগৃহে বাস করিয়া নিছক আলস্যে দিনপাত করেন! পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা সত্যসত্যই উপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা প্রত্যহই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূত্রে প্রত্যহই তাঁহারা গণ্ডা-গণ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের সাদা পৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন ব্রহ্মচারী শূদ্রের ভয়েই অস্থির—পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনো-গতিকে তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তিনি তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন! ইহার অর্থ আর কিছু না—"আমি যখন শূদ্রের মুখ দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাস করিতেছি!" মনকে প্রবোধ দিবার কী চমৎকার যুক্তি-কৌশল! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—বালকেরা জলশূন্য ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্ ঘট্ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যাইবে! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষেই

সাহেব—এ বৃত্তান্তটি প্রমাণাভাবে মারা পড়িয়া যাইবে! এ সিদ্ধান্তটিও তেমনি যে,শূদ্রের মুখ নূতন ব্রহ্মচারীর নয়নগোচর হইলে তিনি যে তপোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন—এ বৃত্তান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যাইবে! এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এগুলি হচ্চে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যান্ধ মস্তিষ্কের নূতন সৃষ্টি! একজন নৈয়ায়িক স্মার্ত্তবাগীশ বলিতে পারেন যে, কলিযুগের বিধানে তিন দিবস কারাগৃহে বদ্ধ থাকা'র নামই বারো বৎসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা! তাহা যদি তিনি বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারিতেন যে কলিযুগের বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শূদ্রের নামই ব্রাহ্মণ!

মুড়া যিনি ব্রাহ্মণ—তাঁহারই যখন এই দশা, তখন, পেটি যিনি ক্ষত্রিয় তাঁহার তো কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক্—কঙ্কালখানা আছে; পেটির আবার তাহাও নাই! কাল-রাক্ষস এমনি তাহাকে নিকিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কাররূপে উদরস্থ করিয়াছে যে, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামের কোপাগ্নিকেই আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমরা আমাদের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে রাম সিংহ লছ্‌মন সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের সিংহরা নামেই সিংহ; তা ভিন্ন ভারতের এ মুড়া-হইতে ওমুড়া-পর্য্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার ত্রিসীমার মধ্যে তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন! ত্রেতাযুগের পরশুরাম যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন—দ্বাপর-যুগের কুরুক্ষেত্র তাহা নিঃশেষিত করিয়া ছাড়িয়াছে। বৈশ্য আবার ততোধিক রহস্য! বর্ত্তমান অব্দে কে যে বৈশ্য আর কে যে বৈশ্য নয় তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!"

খুব সম্ভব যে, পুরা-প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের দ্বিমুণ্ড রাক্ষস ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ-বলে, সমস্ত বৈশ্য-শোণিত উদরস্থ করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিল, তখন সেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগের কঠোর অব্দে আর্য্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাদে একা কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট। বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আর্য্য-শব্দের সাহায্যে তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে বলিতে পারি না। তিন-বর্ণই যখন নাই—তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক বর্ণই কেবল আছে—তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা নিতান্তই "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া"—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। তবে কি একা কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্য্যের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাহ্মণ বেচারী অ্যাকে মরিয়া রহিয়াছে,—সেই মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইবে। রাজপুরুষেরা আমাদের দেশের কোনো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman-এর Certificate প্রদান করিলে তাহাতে যত তাঁহার মান-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে, পূর্ব্বে ইহাঁর মাথায় তেল ছিল না—দয়ার্দ্রচিত্তে আমরা ইঁহার মস্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ইঁহার পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না—আমরা ইঁহার হস্তে জেণ্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোঘ

মন্ত্র-বলে আজ অবধি ইনি ভদ্র লোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন! আমাদের দেশের কোনো চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে Gentlemanএর Certificate প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে আর্য্য উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। ফলে, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর্য্য বলিলে ব্রহ্মণ্য-দেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ'ন; তাঁহার রোষের কারণ এই যে আর্য্য তো সকলেই—ক্ষত্রিয়ও আর্য্য—বৈশ্যও আর্য্য—এবং কলি-যুগের নূতন শাস্ত্র অনুসারে যাঁহার লোহার সিন্দুকে টাকা আছে কিম্বা নামের অন্ত-ভাগে দুই চারিটা ইংরাজী অক্ষর আছে তিনিই আর্য্য! ব্রাহ্মণ তো আর সেরূপ আর্য্য নহে! শাস্ত্রের বিধান মতে ক্ষত্রিয়-বীর্য্যও ব্রহ্ম-তেজের নিকটে নত-মস্তক! তা'র সাক্ষী—বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্টা-ক্ষরে লিখিত আছে "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" ক্ষত্রিয় বল ছার বল—তাহাকে ধিক্! ব্রহ্মতেজই—বল!" ভাগীরথী শুধুতো আর নদী ভাগীরথী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী; তেমনি, ব্রাহ্মণ শুধু তো আর আর্য্য-শর্ম্মা নহে—শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেব শর্ম্মা। গঙ্গাস্নানকে গঙ্গাস্নান না বলিয়া কেহ যদি বলেন নদী-স্নান, তবে তাহা শ্রবণ মাত্রে—এমন যে শীতলসলিলা দেবী, ভাগীরথী, রোষের বাড়বানলে তিনিও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওঠেন না! তেমনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজকে ব্রহ্মতেজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্যতেজ"—ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র না বলিয়া বলেন "আর্য্য-শাস্ত্র"—ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রাহ্মণ-জাতি না বলিয়া বলেন "আর্য্যজাতি", তবে তাহাতে ব্রহ্মণ্যদেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, এক্ষণকার কালে তিন বর্ণকে এক শব্দে বাচন করিবার জন্য আর্য্য শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা শিরো নাস্তি শিরঃ-পীড়া এবং এক্ষণে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণকে আর্য্য উপাধি প্রদান করিলে

ব্রাহ্মণদেবকে প্রকারান্তরে অপমান করা হয়;—তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিযুগে ভারতবর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি-সমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া জাতি বাচক অর্থে আর্য্য-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। অতএব অধুনাতন কালে আর্য্য শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ স্থলে তাহাকে কিরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্য্য-শব্দের অর্থ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক; এই বিবেচনায় এইখানে তাহার একটা চুম্বক আলেখ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তাহার পরে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাভিমুখে এবং পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশই দূরে দূরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কলিকাতার বাজার-সুলভ দুগ্ধের ন্যায় সর্ব্ব-ঘটেই অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। মহানগরীর অভিধানে যেমন পোনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা দুগ্ধও দুগ্ধ শব্দের বাচ্য—কলিযুগের অভিধানে তেমনি ভদ্রাভদ্র যে-সে-বংশীয় বড়মানুষ আর্য্য নামে অভিধেয়। এই খেদে আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত অমরকোষের কোটরাভ্যন্তরে মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিল—লোকালয়ে তাহাকে বড় একটা বাহির হইতে দেখা যাইত না;—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাবকালে আর্য্য নারীদিগের দেখাদেখি আর্য্য-শব্দের বহিস্ফূর্ত্তি একেবারেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ একি মহামারী ব্যাপার! বিদ্বজ্জন-পুরের পথে ঘাটে মাঠে হাটে আর্য্যশব্দের একি প্রবল বন্যা! আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের রাতারাতি এই যে নূতন অভ্যুদয়, ইহার

মূল প্রবর্ত্তক মনুও না, যাজ্ঞবল্ক্যও না, পরাশরও না, বেদব্যাসও না—তবে কে? আর কে—উক্ষতরণ (অর্থাৎ Oxford) চতুষ্পাটীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্ ম্যাক্‌স্‌মূলার ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণি।

ইতিপূর্ব্বে আর্য্য-জাতিকে একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা গিয়াছে, এক্ষণে আর্য-শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সেইরূপ কল্পনা করা হো'ক। পুরাণের একস্থানে এইরূপ একটা উপন্যাস আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে এক হাঁড়ি জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল; কালক্রমে যখন সে বড় হইয়া হাঁড়ির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; যখন সে আরো বড় হইয়া ডোবার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; এইরূপ করিয়া মৎস্যটা ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে যখন সমুদ্র হইতে মহা-সমুদ্রে প্রবেশ করিল তখন ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান সংকুলন হওয়া ভার হইয়া উঠিল। কিন্তু আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতি এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল; ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র-হইতে ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে সংক্রামিত হইয়া—এককালে যাহা শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্য ছিল কালক্রমে তাহা কীট হইতে কীটাণুতে পরিণত হইতে লাগিল। ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পুষ্করিণীতে এবং তথা হইতে অমরকোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মৎস্যটি মর্ত্ত্যলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্‌-স্‌মূলার ভট্ট দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া—আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে—সূর্য্যের উদয়াস্তস্পর্শী মহা-সমুদ্রে—প্রত্যানয়ন করিলেন।

অতএব ম্যাক্‌স্‌মূলারের আর্য্য স্বতন্ত্র এবং অমরকোষের আর্য্য স্বতন্ত্র।

এতদিন ধরিয়া আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে ক্বচিৎ কোনো সংস্কৃত পুঁথির অসূর্য্যম্পশ্য নিভৃত নিকেতনে কীটে কীটে জর্জ্জরিত হইতেছিল—কেহই তাহাকে পুছিত না; এতদিনের সাড়াশব্দ-রহিত চুপচাপের পরে—শ্রীমন্ ম্যাক্‌স্‌মূলার ভট্ট বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণকুহরে আর্য্য-মন্ত্রের ফুৎ-কার প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসুপ্ত আর্য্যতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন—এখন আর রক্ষা নাই! যখন ম্যাক্‌সমূলারের নামও কেহ জানিত না—ম্যাক্‌স্‌মূলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতেছেন—সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মর্ম্ম-নিহিত সার সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে—সে দিকে কেহই বড় একটা কাণ পাতিলেন না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগরীর বক্ষ-প্রদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অগ্নিময় বাক্য-সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে—তাহা কাহারো গ্রাহ্যে আসিল না; বিলাত-হইতে আর্য্যমন্ত্রের আমদানি হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠের উদ্গীরিত আর্য্য নামের চীৎকার ধ্বনিতে ইয়ঙ্‌ বেঙ্গলের গাত্রে থরহরিকম্প উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যদেব দানোয়-পাওয়া শব-দেহের ন্যায় মৃত্যু-শয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং ফিরে-ফির্ত্তি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন; ইতিপূর্ব্বে কোনো-পুরুষেই যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনার চৌকাট মাড়াইতে সাহসী হ'ন নাই সেই সকল ব্রাহ্মণেতর বংশের তত্ত্ববাগীশেরা অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিলেন;—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ঠেলিয়া আপনারা জ্ঞান-সমুদ্রের উঁচা পাড়ে আরোহণ পূর্ব্বক

যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি যেখানকার যতকিছু নিগূঢ় রহস্য সমস্তই বিস্মৃতির রসাতল-গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য সুধীবর বেশে (সু ধীবর-বেশে) কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; কাঁহারো জালে একটা তাঁবার চাকৃতি উঠিল, তিনি ভাবিলেন "এমন উজ্জ্বল সুবর্ণ তো একালে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" কাঁহারো জালে একটা সাত-রাজার-ধন মাণিক উঠিল অমনি "এ আবার কি—দূর" বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা রসাতলে ফেরত পাঠাইলেন। ম্যাক্‌স্‌মূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আর্য্য বলিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা জানিতেন কি না সন্দেহ! তাহার পরে ম্যাক্‌স্‌মূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্য্য-মন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার দুই একরত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্য্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তান্তটি স্মরণে জাগ্রত রাখিবার মানসে ম্যাক্‌স্‌মূলার ভট্টকে আমরা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব এবং বঙ্গীয় নব্য আর্য্যদিগকে গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিব। গোস্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিতে গেলে গোস্বামী বলিতে যদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্তু সে অর্থে গোস্বামী উপাধি ম্যাক্‌স্‌মূলার ভট্টকে কিছুতেই শোভা পায় না; কেননা তিনি খড়দ'র গোস্বামীও নহেন—শান্তিপুরের গোস্বামীও নহেন—তিনি উক্ষতরণের অর্থাৎ Oxford এর গোস্বামী; অনেক উক্ষ Ox এবং গো যেখানে নিত্য নিত্য গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি গোস্বামী! তাঁহাকে যদি গোরক্ষক অর্থে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় "যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক!" অতএব তাহাতে কাজ নাই! আমরা তাঁহাকে চলিত অর্থেই গোস্বামী বলিব। গোস্বামী কিনা মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু—এই অর্থেই আমরা তাঁহাকে গোস্বামী বলিব। অনতিপরেই প্রকাশ

পাইবে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক-আর্য্য এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সঙ্-আর্য্য দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ফল কথা এই যে, আর্য্য চারি প্রকার—(১) বৈদিক আর্য্য, (২) পৌরাণিক আর্য্য, (৩) বৈজ্ঞানিক আর্য্য, (৪) সঙ্ আর্য্য।

প্রথম, বৈদিক আর্য্য;—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্য্য।

দ্বিতীয়, পৌরাণিক আর্য্য,—পৌরাণিক আর্য্যের চতুর্দিকে কোনো প্রকার জাতীয় গণ্ডির ঘের দেওয়া নাই—সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন; তাহার সাক্ষী—পুরাণে লিখিত আছে "কর্ত্তব্যমাচরন্ কার্য্যমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "কর্ত্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্ত্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হ'ন তিনিই আর্য্য শব্দের বাচ্য।"

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক আর্য্য;—এই আর্য্যই গোস্বামীর আর্য্য; এ আর্য্যের বিশাল পরিধির অভ্যন্তরে বাঘে-গরুতে একত্রে জল-পান করে; ইংরাজ বাঙ্গলী, ফরাসীস্ জর্ম্মান্, রুষীয় পোল্, সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের সহিত মেলামেশা করে; এ আর্য্যের সুবিস্তীর্ণ ললাটে এই মন্ত্র-বচনটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে, "উদারচেতসাং পুংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং" উদারচেতা পুরুষ-দিগের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি-কুটুম্ব।

চতুর্থ, সঙ্ আর্য্য;—এইটিই গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য; এ আর্য্য বৈদিক আর্য্য নহে ইহা বলা বাহুল্য; কেননা, সত্য-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং ত্রেতা-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ঐ তিন বর্ণের সমষ্টি এ দুই আর্য্য কলি-যুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না—কেমন করিয়াই বা স্থান

পাইবে? এ ছার কলিযুগে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই; কাজেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সমষ্টি বলিতে কেবল আকাশ-কুসুমই বুঝায়—তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্য্য পৌরাণিক আর্য্যও নহে; কেননা পৌরাণিক আর্য্য জাতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই ক্রোড়ে লইতে প্রস্তুত—গুহ চণ্ডালকেও তিনি ত্যজ্য পুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আর্য্য সদাচারের পক্ষপাতী—সঙ্‌ আর্য্য সদসৎ সকল-প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী; এ আর্য্য সামান্য একটি লোকাচারের পান হইতে চুন খসিলেই—কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে মনে করে; গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফের্‌তাদিগের প্রতি গোবরের ব্যবস্থা করে; ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দ্দার হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে; নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্য্যের সাধ্য কি যে এ আর্য্যের নিকটে এগোয়! এ আর্য্য বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে; কেননা গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য, ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসিস্‌ জর্ম্মান প্রভৃতি সকল আর্য্যজাতিকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করে; কিন্তু এ আর্য্য আপনার দলের মূষিকসম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্য ছাড়া আর আর সমস্ত আর্য্যকেই—সিংহ সম্প্রদায় ভুক্ত আর্য্যকেও—ম্লেচ্ছ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য—বৈদিক আর্য্যও নহে, পৌরাণিক আর্য্যও নহে, বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে—তাঁহারা যে কোন আর্য্য সেইটিই বিষম সমস্যা! স্পষ্ট কথা বলিতে কি—এ আর্য্য আর্য্যই নহে কেবল আর্য্যের একটা ভান—আর্য্যের একটা প্রহসন! একটি জ্যেষ্ঠতাত বালক যে-রকমের জ্যেষ্ঠতাত—এ আর্য্যটি ঠিক্‌ সেই রকমের আর্য্য। জ্যেষ্ঠতাত বালকের জ্যেঠামি যেমন একটা রোগ, এ আর্য্যের আর্য্যামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং শিষ্যের সঙ্‌ আর্য্য উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া

কাহার কিরূপ ভাবগতি তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

মহর্ষি ব্যাসের প্রণীত স্মৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বচন আছে—সেটি এই ;—"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" "ব্রাহ্মণের এমন বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা" এই ঋষিবাক্যটি'র নিক্তির ওজনে গুরু এবং শিষ্য দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন আর্য্যকে তৌল করিয়া দেখিলেই কাহার কিরূপ মূল্য তাহা তদ্দণ্ডেই ধরা পড়িবে।

ব্যাস ঋষি বলেন যে, একতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ ;—গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্যের একতা এমনি জগদ্ব্যাপী যে, তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস প্রভৃতি নানা দেশের নানা আর্য্য-জাতিকে সাজাত্য-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্য-দিগের আর্য্য একতা'র এমনি বিরোধী যে, যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য এক্ষণে ক্ষত্রিয়-শূন্য এবং বৈশ্য-শূন্য সুতরাং হাত পা খোঁড়া, আর ব্রাহ্মণ জাতি সে আর্য্যের মস্তক হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান-বিহনে তাহা মস্তিষ্ক-বিহীন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাঁহারা গায়ের জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খোঁড়া মস্তিষ্ক-বিহীন ভারত-বর্ষীয় আর্য্য-সন্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্য্য, আর ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট জ্ঞানবান এবং তেজীয়ান আর্য্যেরা আর্য্যই নহে—তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছ! নরাধম! বর্ব্বর!

ব্যাস-ঋষি বলেন "সমতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ";—বৈজ্ঞানিক আর্য্যের এমনি উদার সমতা-গুণ যে তাহা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব একেবারেই কোপাইয়া সমভূম করিয়া দিয়াছে ; পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য আত্ম-গরিমায় ভোঁ

হইয়া আপনার বেলায় তিলকে তাল দেখেন এবং অন্যের বেলায় তালকে তিল দেখেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্য-জাতির ভাল মন্দ স্বভাব-চরিত্র হরেদরে সমান—তাই কতকগুলা ছেলে-ভুলানিয়া অমূলক যুক্তি দ্বারা সকল লোককেই তাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই ধর্ম্মপুত্রযুধিষ্ঠির এবং ইউরোপীয় আর্য্যেরা শকুনি-মাতুলের প্রপিতামহ! অর্থাৎ যেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন না—দ্যূতক্রীড়া ছিল না—রমণীহরণ ছিল না—দ্বেষ হিংসা মদ মাৎসর্য্য এসব কোনো বালাইই ছিল না—প্রত্যুত সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা মদ্য-পান বেশ্যাসক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না—সকলেই জিতেন্দ্রিয় যোগীপুরুষ ছিলেন! তাহার আরো কিছুদিন পরে যেন চাণক্য ছিলেন না—নরহত্যা ছিল না! রঘুনন্দনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্তবাগীসেরা মূল-গ্রন্থ-সকলের শব্দ এবং অর্থ অবলীলাক্রমে উল্টাইয়া দিয়া (এমন কি ব-য়ের পেটকাটিয়া তাহাকে র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া) যেন হয়কে নয় করিতে জানি-তেন না—প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষের আর্য্যেরা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্দ্র! আর, ইউরোপীয় আর্য্যেরা সকলেই চাণক্য, সকলেই শকুনি! কি চমৎকার সমতা!

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, সত্যতা ব্রাহ্মণের তৃতীয় আর-একটি পরিচয়-লক্ষণ;—গোস্বামীর অর্য্যের সত্যতা সূর্য্যালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান! সে সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্য্য ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে গোস্বামীর শিষ্যদিগের যত কিছু সত্যতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা!

তাঁহারা বলিবার সময় বলেন "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি"—গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও যিনি গঙ্গা গঙ্গা বলেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন" অথচ প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সময়—যিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাঁহারও যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন আর যিনি কোনো জন্মেই গঙ্গার ত্রিসীমা মাড়া'ন না তাঁহারও সেই পাপের সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন; "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ" এ বচনটির প্রতি এতই যদি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধাভক্তি তবে বিলাত ফের্তা বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধান না দিয়া গঙ্গাস্নানের বিধান দিলেই তো হইতে পারে—তাহা তাঁহারা না দে'ন কেন? তবেই হইতেছে যে, তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধানে নিষ্পাপ ব্যক্তিরই পাপ ধৌত হইয়া যায়, পাপী ব্যক্তির কোনো পাপই স্বস্থান হইতে তিল মাত্রও বিচলিত হয় না! তাঁহাদের ঔষধ সেবনে নীরোগ ব্যক্তিই আরোগ্য লাভ করে—রোগী ব্যক্তি যেমন আছে তেমনি থাকে! কি চমৎকার সত্যতা!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য যেমন একতা সমতা এবং সত্যতার একটি জ্বলন্ত আদর্শ, তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য তেমনি অনৈক্য বৈষম্য এবং অসত্যতার অগাধ পঙ্করাশি। গোস্বামী তাঁহার আপনার মতো কার্য্য করিতেছেন—মহতের মতো কার্য্য করিতেছেন—পৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্য্যজাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদর মূলে কুঠার আঘাত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে একতা সমতা এবং সত্যতার জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যেরাও তাঁহাদের আপনাদের মতো কার্য্য করিতেছেন—কাণ্ডজ্ঞান রহিত ইতরের মতো কার্য্য করিতেছেন—অনৈক্য বৈষম্য এবং কপট ব্যবহারের জিলিপির পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়া তুলিতেছেন—ভ্রাতৃ-

বিচ্ছেদের জ্বলন্ত হুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আহুতি প্রদান করিতেছেন ;—এখন কে আর্য্য কে অনার্য্য, শ্রোতৃ-মহোদয়েরা তাহা মনে মনে নিস্তব্ধে ঠাহরিয়া দেখুন্। এই পুরাতন ঋষি-বক্যটি যদি সত্য হয় যে, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতাচ" ব্রহ্মণের এমত বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা, তবে অগত্যা এইরূপ স্বীকার করিতে হয় যে, গোস্বামীর আর্য্যই প্রকৃষ্টরূপে ব্রাহ্মণলক্ষণাক্রান্ত এবং তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য চণ্ডালেরও অধম লক্ষণাক্রান্ত! অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে—প্রথমতঃ আর্য্যামি রোগ কি? দ্বিতীয়তঃ সে রোগের গোড়ার সূত্রটা কি? তৃতীয়তঃ সে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ?

প্রথম আর্য্যামি রোগটা কি? রোগটা আর কিছু না—বাতুলের প্রলাপ! আর্য্যামি করা স্বতন্ত্র এবং আর্য্যোচিত কার্য্য করা স্বতন্ত্র! যাঁহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সত্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তাঁহারাই আর্য্যোচিত কার্য্য করেন। পৃথিবী-মাতার মুখ-উজ্জ্বলকারী বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন রায় আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন; কঠোর অধ্যবসায়ী পরহিতপরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; অকূল পুরাতত্ত্ব সাগরের অদ্বিতীয় রত্ন-ধীবর ম্যাক্স্ মূলার আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; আর, যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত—না কিছু করিয়া বেয়াল্লিস কর্ম্মা, যাঁহারা হাসির জায়গায় কাঁদেন কান্নার জায়গায় হাসেন এমনি যাঁহাদের কবিত্ব-রসবোধ, তাঁহারা যখন-তখন বুক ফুলাইয়া বলেন "আমরাই আর্য্য—ইংরাজ ফরাসীস্ জর্ম্মান প্রভৃতি আর আর যাবতীয় সভ্য জাতি ম্লেচ্ছ নরাধম; আমাদের পুষ্পক বিমান ছিল—ইউরোপের রেল্‌গাড়িই সার; আমাদের অগ্নি-অস্ত্র বরুণ-অস্ত্র ছিল—ইউ-

রোপের কামান বন্দুকই সার; আমাদের স্বর্গমর্ত্য-রসাতলভেদী ধ্যান-বার্ত্তাবহ ছিল—ইউরোপের তাড়িত বার্ত্তাবহই সার;” এই যে সব শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং গগনভেদী স্পর্দ্ধাবাণী—চল্তি ভাষায় যাহাকে বলে ছোটো মুখে বড় কথা—ইহারই নাম আর্য্যামি!

দ্বিতীয়, আর্য্যামি-রোগের গোড়া’র সূত্রটা কি? গোড়ার সূত্রটা আর কিছু না—ইংরাজদিগের “ওঠ্ বোস্” মন্ত্র! ইংরাজেরা যখন আমাদিগকে “বোস্” বলিয়াছিল তখন আমরা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই বসিয়া পড়িয়াছিলাম; ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আমাদিগকে মুখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন “তোমরা আফ্রিকবাসী কালো নিগর” আর অমনি আমরা করযোড়ে বলিলাম “আমরা দীন হীন অধম বাঙ্গালী, আমাদের কোনো সঙ্গতি নাই, তোমরাই আমাদের মা-বাপ, তোমরাই আমদের হর্ত্তা-কর্ত্তা!” ইংরাজেরা “বোস্” বলিতেই যেমন আমরা বসিয়া পড়িয়াছিলাম—“ওঠ্” বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উচ্চতরণ-চতুষ্পাটীর অধ্যাপকেরা আদর করিয়া আমাদিগকে বলিলেন “তোমরা আর্য্য!” আর আমাদের আর্য্যতেজ দেখে কে? তদ্দণ্ডেই আমরা উঠিয়া-দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া সিংহনাদে বলিয়া উঠিলাম “তোমরা ম্লেচ্ছ—আমরা আর্য্য! তোমাদের আছে কি—আমাদের নাই কি? তোমাদের একমাত্র সম্বল বিজ্ঞানের গোটাকত কপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত বই না—আমাদের বেদ আছে, স্মৃতি আছে, তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে—নাই কি? আমাদের জাতির সঙ্গে কি তোমাদের জাতির ঘুণাক্ষরেও তুলনা হইতে পারে।” কি আশ্চর্য্য! ওঠ্ মন্ত্রের চোটে এক নিমেষের মধ্যেই আমাদের বুলি ফিরিয়া গিয়া—পূর্ব্বে যেমন আমরা নেংঠে ইঁদুর হইয়া তলে গুঁড়ি মাড়িয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হইয়া গর্জ্জন করিতে সুরু করিলাম। ঈশ্বর করুন যেন এ-হেন

সুখ-স্বপ্ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই "পুনর্মূষিকো ভব" শুনিয়া হঠাৎ আমাদের চক্ষুস্থির না হয়!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা গোস্বামীর নিকট হইতে আর্য্য-মন্ত্রটি চুপি চুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল-লোকেই জানে অথচ সে বৃত্তান্তটি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষা-গুরুকে ভাবে গতিকে নূতন একপ্রকার গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিলেন—সে গুরু-দক্ষিণা রজতের পূর্ণচন্দ্র নহে—তাহা হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র! অর্থাৎ তাঁহারা এইরূপ ভাণ করিলেন—যেন জাতিবাচক আর্য্য শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তাঁহারা, আর, আর্য্যও তাঁহারা; তা বই—ম্যাক্‌স্‌মূলার যেন কেহই নহে—জাতিবাচক আর্য্যশব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তিনি নহেন, আর্য্যও তিনি নহেন; প্রত্যুত তিনি ম্লেচ্ছ নরাধম! ইহারই নাম "তোমার শীল তোমার নোড়া, ভাঙ্‌ব তোমার দাঁতের গোড়া!" আর কিছু না—একটি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরি প্রদান করিলে প্রদাতা এবং গৃহীতা উভয়েরই তাহাতে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা; প্রদাতার শক্ত হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির এক আধ আঁচড়ে বেশী কি আর হইবে—তাহা মহিষ-শৃঙ্গে মশক দংশন বই আর কিছুই নহে! কিন্তু দুগ্ধ-পোষ্য বালকের কচি হাড়ে তাহা একটা-না-একটা কাণ্ড না বাধাইয়া সহজে ছাড়ে না। মূষিক যদি সিংহকে গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তবে সিংহের তাহাতে কিছুই হয় না—তাহার লাঙ্গুলের একগাছি লোমও স্খলিত হয় না; কিন্তু তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মূষিকের-পো যদি আপনাকে সিংহ অপেক্ষাও বড় মনে করিয়া বিড়ালকে তাড়া করে, তবে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; তাহাই এক্ষণে ঘটিয়াছে! বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা ম্যাক্‌স্‌মূলার প্রভৃতি আচার্য্যগণকে ম্লেচ্ছই বলুন আর বর্ব্বরই বলুন তাহাতে সেই সকল প্রবীন সমরাগ্নি-পরীক্ষিত মহারথীগণের কিছুই

আসিবে না যাইবে না ; কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া—একা বীর ডন্ কুইক্‌সোট যেমন রজিনান্টিতে আরোহণ করিয়া—অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া—প্রিয়তমা ডল্‌সিনিয়ার অমোঘ প্রসাদ-বলে বলী হইয়া—পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যে তেমনি উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা উল্টাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে—কেহ বা টিকি রাখিয়া, কেহ বা ফোঁটা কাটিয়া, কেহ বা গেরুয়া পরিয়া কেহ বা পৈতার গোচ্ছা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া, এক এক জন এক এক মহামহোপাধ্যায় আর্য্য সাজিয়া আসরে নাবিয়া তাল ঠুকিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতেছেন—এটা তাঁহারা ভাল করিতেছেন না! তাঁহাদের কি স্মরণ নাই যে, লা-মাঙ্কা নগরের বীরকেশরী ডন্‌কুইক্‌সোট্ যতবার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উল্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন—তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই! এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদন্ত চপেটিতকপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন "বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর" knight of the srrowful figure!" রোগ তো আর গাছে ফলে না! এই উন্নত শতাব্দীর পরিস্ফুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্ফুট বিধান সকল প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো—হাতের লেখা পুঁথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ না করা—গেরুয়া বস্ত্র ছাড়া বস্ত্র পরিধান না করা—খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা—শুদ্ধ কেবল পুরাণের রূপক এবং হেঁয়ালি ভাঙিয়া সেই উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের মহোচ্চ শিখর-পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাজমার্গ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া—এইরূপ যাহার অশেষ বিশেষ উপসর্গ—তাহা যদি রোগ না হয়, তবে রোগ কি আর গাছে ফলে ?

তৃতীয়, রোগের চিকিৎসা। আর্য্যামি রোগের চিকিৎসা সাম্যপন্থী মতে হইলেই ভাল হয়; সে মতের মূল-মন্ত্র এই যে "সমে সামাং প্রযোজয়েৎ"—সমানে সমান প্রয়োগ করিবেক। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "কে বলে আর্য্যামি একটা রোগ, বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তাহা সাহেবি-আনা রোগের মহৌষধ!" বটে—কিন্তু সে কিরূপ ঔষধ? সে ঔষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি!—তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায়! তবে আর তাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি প্রকারে? বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া তোলে। সাহেবিআনার ঔষধ স্বতন্ত্র;—ইংরাজদিগের বাহ্য আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবিআনা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নাম উনবিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা; এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ; তা ভিন্ন আর্য্যামিও সাহেবিআনা রোগের ঔষধ নহে, সাহেবিআনাও আর্য্যামি-রোগের ঔষধ নহে; আর্য্যামি-রোগের ঔষধ তবে কি? না "সমে সামাং প্রযোজয়েৎ"—আর্য্যোচিত কার্য্যই আর্য্যামি-রোগের একমাত্র ঔষধ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াই আর্য্য হইয়াছিলেন; তবে কি? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্যজাতি যেরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছে তাঁহারাও সেইরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছিলেন; দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছিলেন;—কী দুইনিয়ম? না, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সন্ততির নিয়ম Law of heredity এবং সঙ্গতির নিয়ম Law of adaptation। সন্ততি বা সন্তান শব্দের অর্থ সং তান—তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ, একটানা প্রবাহ;

জীব-জন্তু-সকলের আনুপূর্ব্বিক একটানা প্রবাহ যে-একটি সার্ব্বভৌমিক মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সন্ততির নিয়ম; সে নিয়ম এই যে, সন্তান-সন্ততিরা কোনো-না-কোনো অংশে পিতৃপুরুষদিগের অনুধর্ম্মী হইতে চায়ই চায়; এ নিয়মের মূল-মন্ত্র—"বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ্ নেই হোয় তো থোড়া থোড়া"। সঙ্গতির নিয়ম কি? না চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে না পারিলে কোন জীবই পৃথিবীতে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না—ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে গেলেই জীবের পৈতৃক গুণ-সকল অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্ত্তনের নিয়ম বা গতির মিয়ম বা উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবর্ত্তিক-নিয়ম এবং সন্ততির নিয়মকে সংক্ষেপে বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌলিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি;" পারিবর্ত্তিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা," এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের জন্ম-স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি নিয়মিত হয়।

বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা এইটেই জানেন, তা বই এটা জানেন না যে মহাজন যিনি—তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে তাঁহার নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন। দুই হাত নহিলে তালি বাজে না; এই জন্য জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম, এবং গতির নিয়ম দুইই সমান আবশ্যক। কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম বলিয়াই—কি পশুর মধ্যে—কি বর্ব্বর জাতির মধ্যে—কি

আর্য্যজাতির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তাহা সমান-ভাবে কার্য্য করে; পায়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফ্রীর পুত্র কাফ্রী হয়, বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয়; জাতির ইতর-বিশেষে কৌলিক নিয়মের কার্য্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় না—কৌলিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান ভাবে কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, পারিবর্ত্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম—তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়াই—তাহা সকল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্য্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার অভ্যন্তরে তেমনি ভাবে কার্য্য করে; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রতভাবে কার্য্য করে, প্রসুপ্ত জাতির মধ্যে প্রসুপ্তভাবে কার্য্য করে। ফলেও তাই দেখা যায় যে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা" এ নিয়মটি মনুষ্যের মধ্যে যেমন চক্ষুষ্মান্ ভাবে কার্য্য করে—পশুদিগের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও না। গ্রীষ্মদেশের হস্তী শীতদেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে "নৈসর্গিক দম্পতি নির্ব্বাচন" (Natural selection) এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) এই দুই জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘন-লোমরাজি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালি ইংলণ্ডে যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্‌ফিনে উড়ানী ঝরিয়া পড়িয়া চারি আঙ্গুল পুরু শীতবস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বর্ব্বর-জাতি অপেক্ষা সভ্য-জাতির মধ্যে বেশী প্রবল। সুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-রোধ করে বলিয়া সেই অপরাধে সেই শত-যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া যে-সে জাতির কর্ম্ম নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্ত্তিক নিয়ম উভয়ে যদিচ পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ

যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী ; বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্—পতি-পত্নীর ন্যায় দোঁহে দোঁহার প্রাণপরিপোষক। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব-মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে টক্কর দিতে পারিতেছেন ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কৌলিক নিয়ম রীতিমত কার্য্য করিতেছে; প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই আর্য্য-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাঁহারা নামে আর্য্য—কাজে নীগ্রো। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় ; যে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদন করা হয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গেদ্দা ঠেসান্ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধু পূর্ব্বপুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোনো আর্য্যজাতিই আর্য্য হ'ন নাই ; প্রত্যুত অন্তরের এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সঙ্গ্রাম্ করিয়াই আর্য্যেরা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রাম করে—বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে ; বিজ্ঞান-অস্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে মানসিক প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উভয় অস্ত্রেরই পরিচালনা-দ্বারা প্রকৃতির সহিত সঙ্গ্রামে জয়-লাভ করিয়া আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন ; নচেৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া, এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন আর্য্যজাতিকেই আর্য্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে,

আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন—পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন না, তবে তাঁহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিজ্ঞান-অস্ত্রে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বহু পূর্ব্বে যে সময়ে আপামর-সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার প্রধান প্রমাণ ছিল পুরাণের এই একটা অলীক সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতির্ব্বিৎ ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে,

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং
মন্যন্তে খে যতো গোল স্তস্য কোর্দ্ধং কচাপ্যধঃ॥"

ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, যেহেতু পৃথিবী গোল, তাহার ঊর্দ্ধই বা কি আর অধোই বা কি?

পুনশ্চ

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থাং
আত্মানমস্যা উপরিস্থিতং চ
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থ সংস্থা
মিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি।

(এখানে "কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী)

অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা *
শ্ছায়া মনুষ্যা ইব নীর তীরে
অনাকুলা স্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র ॥”

“যিনি যেস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ মনে করেন; যাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাঁহারা পরস্পরকে ত্যাড়্চা ভাবে (অর্থাৎ কাত-হইয়া-পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর উল্টাপিটে জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জলস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধো-মস্তক, কিন্তু আমরা যেরূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উক্ত অধঃস্থিত এবং তির্য্যক্-স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক্ সেইরূপ অনাকুল ভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।” ভাস্করাচার্য্যের স্বহস্ত-রচিত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন? না উল্টা আরো এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেখানে একবাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেখানে তিনি একাকী শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে—কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শোনে নাই এইরূপ একটা নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া অসংকুচিত চিত্তে—অম্লানবদনে—বলিলেন যে, “পৃথিবী গোল”—ইহা কি

* “কুদলান্তরস্থা”—কু শব্দে পৃথিবী—পৃথিবীর দলান্তরস্থ” অর্থাৎ ছোলার যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোল দুইটি দলে বিভক্ত—একটি দল তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড, আর-একটী দল তাহার নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড; নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারাই “কুদলান্তরস্থ”।

যে সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য। এইরূপ আর্য্যোচিত কার্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আর্য্যামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্—পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্—সকলে যাহা একবাক্যে বলে তাহাই ঠিক্—পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই ঠিক্, তবে আমাদের দেশের পুরাতন জ্যোতিষের আর্য্যতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই বা কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই উনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে কে-ই বা পুছিত আর কে-ই বা তাহাকে গ্রাহের মধ্যে অনিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ধর্ম্ম-অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে—বেণরাজার আমলে—আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলা অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল; আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া—উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া—তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া দিলেন। ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্যামি করিতেন—লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিয়া বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক—রাক্ষস বিবাহই ঠিক্" তবে আজিকের এই হিন্দু-সমাজের আর্য্যত্বই বা কোথায় থাকিত—ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট; ইহাতেই এক-আঁচড়ে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে সংগ্রাম করিয়া—সত্য এবং মঙ্গলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া—

নিক্তির ওজনে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া—আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য আর্য্যেরা কি করিয়াছেন? তাঁহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরুদ্ধে আলস্য-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক—আদুরে ছেলেরা যেমন অষ্টপ্রহর যার-তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে, তাঁহারা তেমনি ভদ্রাভদ্র সকল প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীস্থ বঙ্গজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আর্য্য-গরিমার ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছেন! এইরূপে যাঁহারা সিকি পয়সা দিয়া লাখ টাকা মূল্যের আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাটি বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, সস্তার তিন অবস্থা! এই সকল নব্য আর্য্যদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক যদিচ আর কিছুই নাই কিন্তু উঁহাদের প্রতি মনু, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুরাতন আর্য্যদিগের বাৎসল্যপূর্ণ উপদেশ এখনো-পর্য্যন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহা এই যে, "সত্যসত্যই যদি তোমারা আর্য্য হইতে চাও, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর; লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্য্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিষ্ফল না হয়। আর্য্যামি করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিত জানিও যে আর্য্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র ঔষধ আর্য্যোচিত কার্য্য।" আর্য্যামি এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—অতঃপর সাহেবিআনা কিরূপ তাহার প্রতি একবার মনঃ সমাধান করা যাক্।

আর্য্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি—দুইই সমান। দুই-ই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোব্‌ড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর, টিকি রাখা, ফোঁটা কাটা, ভিতরে পদার্থ নাই মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়ল-গিরি, এইগুলিই ছোব্‌ড়া; এই ছোবড়া-গুলিই আর্য্যামির প্রধান সম্বল। তেমনি আবার, উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কর্ম্মিষ্ঠতা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা এইগুলিই উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা'র মূল উপাদান—এইগুলিই শাঁস, আর, ইংরাজদিগের ন্যায় চটুল-ধরণের চাল্‌ চোল্‌, ইংরাজদিগের ন্যায় জড়ানে-জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটা সাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্‌-ওপিট—এ বলে আমায় ন্যাখ্‌ ও' বলে আমায় ন্যাখ্‌।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজেরা যে কোনো প্রণালীতে যে কোনো কার্য্য করে, বাঙ্গালিরা সেই প্রণালীতে সেই কার্য্য করিলে তাহাতেই তাঁহাদের সাহেবিআনা হয়; তাহা যদি কেহ মনে করেন—সেটি তাঁহার বড়ই ভুল! কেননা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইংরাজেরা যেহেতু ইংরাজি লিখিবার সময় বামদিক্‌ হইতে ডাহিনদিকে লেখনী চালনা করে এই জন্য বাঙ্গালিদের উচিত যে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবার সময় ডাহিনদিক হইতে বামদিকে পারসীক ধরণে লেখনী চালনা করেন; নহিলে যেন তাঁহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে! ফলে এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে ইংরাজদিগের যে কোনো রীতিনীতি বা যে-কোনো আচার ব্যবহার বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। ম্যাকস্‌ মূলার ভট্টের

এ কথা যদি সত্য হয় যে ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসীস্ প্রভৃতি সকল আর্য্য জাতিই গোড়ায় একজাতি ছিল, তবে ইংরাজ-বাঙ্গালি জাতি-দ্বয়ের মৌলিক আচার-পদ্ধতি যে একই ধাঁচা'র হইবে—তাহা তো হইবারই কথা বরং তাহা না হওয়াই বিচিত্র; তবুও যদি এ বিষয়ে কাহারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে—তবে বক্ষ্যমান দুইটি উদাহরণ শুনিলে, সে সন্দেহ তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রথম উদাহরণ ;—বন্ধুগণের সম্মিলন-কালে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ কর-নিপীড়নের (Shakehand এর) প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে যে, সেরূপ নাই, বা ছিল না, তাহা নহে ; কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বসীর প্রথম ঘটনাটিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুরবা ইন্দ্রপুরী হইতে মর্ত্তালোকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে যখন চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, তখন উভয়ে স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরস্পরের হস্ত নিপীড়ন করিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ ;—বিবাহোচিত বর-কন্যার বয়সের ব্যবস্থা ইউরোপে যেরূপ আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল ; তাহার সাক্ষী—মনুর বিধানে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং কন্যার বারো বৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত বয়স। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের বারো বৎসর ইংলণ্ডের পোনোরো বৎসর অপেক্ষা বেশী বই কম নহে।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই মধ্যে এরূপ কতকগুলি মৌলিক আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রচলিত আছে যাহা আর্য্যজাতি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি—একা কেবল ইংরাজদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে ; সে গুলিতে—কি ইংরাজ—কি বাঙ্গালি —কি ফরাসিস্— সকলেরই তুল্য অধিকার ; কাজেই সেগুলি সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদপেক্ষা ব্যাপকতর এরূপ

কতক-গুলি বিষয় আছে যাহাতে আর্য্যানার্য্য সকল জাতিরই সমান অধিকার—যেমন মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি; কাজেই এ-গুলিও সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ধ টোলের ভট্টাচার্য্য হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা সাহেবিআনারই সামিল; কিন্তু তাঁহার সে কথা কোনো কাজের কথা নহে; এটা অন্ততঃ তাঁহার জানা উচিত যে, সকল-প্রকার জ্ঞান-চর্চ্চাতেই সকল জাতিরই সমান অধিকার;—জ্ঞান এবং ধর্ম্ম জাতীয়-শৃঙ্খলের বন্ধন-হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পূর্ব্বতন গ্রীকজাতি যে, মিসরীয়জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল,—তাহা বলিয়া তাহারা কি মিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদ্‌রীজনেরা যে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন—তাহা বলিয়া তাঁহারা কি বাঙ্গালি হইয়া যা'ন? সার্ উইলিয়ম জোন্‌স্ যে, কোনো দেশের কোনো ভাষাই শিক্ষা করিতে বাকী রাখেন নাই—তাহা বলিয়া তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। স্বর্ণ যাহা—তাহা সকল দেশেই সমান—কেবল স্বর্ণের অলঙ্কার দেশ-ভেদে ভিন্ন; তেমনি জ্ঞানের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সকল দেশেই সমান; কেবল জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য প্রযুক্ত তাহার ভাব-ব্যঞ্জক ভাষা দেশ-ভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানের বিভিন্ন পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্ঞান ইংরাজীও নহে—বাঙ্গালিও নহে—সংস্কৃতও নহে, জ্ঞান জ্ঞানই। যাহার ভাণ্ডারে রৌপ্য আছে তাহাকেই আমি বলিব—ধনী; তা সে শিলিঙ্ বেশেই থাক্, আর আদুলি বেশেই থাক্, যে-কোনো বেশেই থাক্, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। সিলিঙ্ অপেক্ষা আদুলি আমদের দেশে সমধিক ব্যবহারোপযোগী—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ সিলিঙ্ দেয়—তাহা কি আমি লইব না? অবশ্যই লইব—দুই হাত পাতিয়া

লইব—লইতে ছাড়িব না; কিন্তু লইয়াই টাঁকশালে দৌড়িব;—ও সেথানে সেই শিলিঙ্‌গুলি দিয়া মনের সাধে টাকা আধুলি সিকি গড়াইয়া লইব; তাহার বাট্টা যত লাগে লাগুক্ সে জন্য কাতর হইব না। ইংরাজেরা কি করে? আমাদের দেশের কাঁচামাল ধূলিরাশির ন্যায় ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়া স্বদেশের ব্যবহারোপযোগী কত কি নূতন নূতন অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করে; আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুঁথি হইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদানগুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া দেশোপযোগী করিয়া লইতে জো পাই তবে সে সুবিধাটি আমরা ছাড়িব কেন? * ফল কথা এই যে, জ্ঞান কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এই সকল মনুষ্যোচিত গুণ জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের এক-চেটিয়া পণ্যদ্রব্য হইতে পারে না; এ গুলির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবার অধিকার সকল জাতীয় সকল মনুষ্যেরই সমান; জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা কোনো গতিকেই সাহেবিআনা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র, আর বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা দারাকে ডিয়ার বলিবার জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র! জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে মানুষের মতো মানুষ হয়; চং-উপার্জ্জনের জন্য

---

* এই সুযোগে ফাঁকতালে একটী কথা বলিয়া লই;—ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ-কালে অনেক লেথক কিম্ভুত-কিমাকার নূতন এক তরো ভাষা গড়িয়া তোলেন এইটী বড় দোষের কথা! আমরা তাই "Letter Killteh spirit giveth life" এই বচনটীর অনুবাদ করিতে হইলে এইরূপ অনুবাদ করি যে, মৌথিক শব্দ বাক্যের প্রাণ বধ করে, আন্তরিক ভাব বাক্যে প্রাণদান করে; নচেৎ এরূপ অনুবাদ করি না যে, "অক্ষর বধ করে ও আত্মা জীবন দান করে!" "স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট" এরূপ ধরণের অনুবাদ শুনিলে আমাদের গাত্রে জ্বর আইসে!

ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে বনমানুষের মতো মানুষ হয়;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে-সকল রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সমস্ত আর্য্য-জাতির সাধারণ-সম্পত্তি—সাহেবিআনার উপকরণ-গুলি তাহার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না; এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সার উপাদান যাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি, তাহার ভিতরেও সাহেবিআনার কোনো প্রকার উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ইংরাজদিগের এরূপ-কতকগুলি বিশেষ রকমের হাব-ভাব আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী চাল-চোল্ যাহা আর্য্যগণেরও সাধারণ সম্পত্তি নহে, আর, মনুষ্য-জাতিরও সাধারণ সম্পত্তি নহে—সেই গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ; সাহেবি-আনার প্রকরণ কী যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে; কী? না অনুকরণ। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি শেষোক্ত প্রকরণের মধ্য দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলে তাহাকেই আমরা বলি—সাহেবিআনা। এমতে দাঁড়াইতেছে যে, অনুকরণই সাহেবিআনা-রোগের মূল-সূত্র।

অনুকরণ কেবল একটা দিক্-বিদিক্-শূন্য অন্ধ চপলতা—তাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই। অনেক সময় অনুকরণের এটা মনে থাকে না যে, "যার যা তারে সাজে, অন্যে তাহা লাঠি বাজে" তাই সে প্রায়ই বিস্‌মোল্লায় গলদ করিয়া বসে, প্রায়ই সে ভাল মনে করিয়া একটা কাজ করিতে যায়—করিয়া বসে একটা বেতালা বেসুরা বেমানান কিম্ভুত-কিমাকার কাণ্ড! * হিন্দু সন্তানের (Esquire) ইস্কোএআর পদবী

* এই প্রসঙ্গে মহামান্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী অতি সরস গল্প বলিলেন—সেটী এই;—একজন পল্লীগ্রামের কবিরাজ তাঁহার একটী

ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ ;—ইউরোপের মধ্যম-অব্দের শাস্ত্র-অনুসারে স্কোএআর পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের নীচেই যেমন কায়স্থ—নাইটের নীচেই তেমনি স্কোএআর। ইউরোপের মধ্যম-অব্দে নাইট্ যখন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম

ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার হাতের একজন রোগীকে দেখিতে গেলেন। রোগীর হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন "নাড়ীতে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য দেখিতেছি—পথ্য-বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার তো কোনো অন্যথাচরণ কর নাই?" রোগী বলিল "আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন আমি সেই রূপই করিয়াছি—তাহার একচুলও এদিক্ ওদিক্ হয় নাই," কবিরাজ বলিলেন "তোমার হাতটা দেও-দেখি—আর একবার দেখি"—হাত দেখিয়া বলিলেন "সত্য বল দেখি তুমি ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছ কি না?" রোগী বলিল "আপনি ঠিক আঁচিয়াছেন—আমি যথার্থই ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছি," কবিরাজ বলিলেন "তোমার নাড়ী দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি—ওরূপ কার্য্য আর যেন না হয়"। কবিরাজের এইরূপ অসাধারণ নাড়ী-জ্ঞান দেখিয়া বাড়ি-শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কবিরাজ ছাত্র-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথি-মধ্যে তাঁহার ছাত্রটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কবিরাজ মহাশয়, পুঁথিতে কোথাও তো এরূপ লেখে না যে, নাড়ী দেখিয়া কে কি খাইয়াছে না-খাইয়াছে তাহার উপলব্ধি সম্ভবে ; আপনি তবে নাড়ী দেখিয়া কেমন করিয়া ইক্ষু ভক্ষণের ব্যাপারটা অনুমান করিলেন—সেইটী আমাকে বুঝাইয়া বলুন?" কবিরাজ বলিল "বাপু! এটা আর বুঝিলে না! রোগীর ঘরের চারিদিকে আকের ছিব্ড়া পড়িয়া আছে দেখিলাম—দেখিয়া ভাবিলাম যে, সে ঘরে আর কে আক খাইতে যাইবে—রোগীরই এ কাজ! এখন বুঝিলে?" ছাত্র বলিল "এই বই না? এতো আমিও পারি! কবিরাজ মহাশয়—এবারে যখন আপনি রোগী দেখিতে যাইবেন তখন রোগ নির্ণয়ের ভারটা আমার উপর সমর্পণ করিবেন।" কবিরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ছাত্রটী রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সেখানে এক ঘর লোক বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া তাহার উৎসাহানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর ঘরের চারিদিকে নেত্র-

করিতেন—স্কোএআর তখন রেকাব ধরিতেন; নাইট্ যখন দ্বন্দ-যুদ্ধে যাত্রা করিতেন—স্কোএআর তখন তাঁহার সাজ-সজ্জা বহন করিতেন; ইহাতেই স্কোএআর পদবীর এত মান-মর্য্যাদা! শুধু যে কেবল ইংরাজদের মধ্যেই এরূপ তাহা নহে, আমাদের দেশের মান্যগণ্য শ্রেণী-বিশেষের মধ্যেও নাইটের সেবক স্কোআর পদবীর ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবক দাস পদবী বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সজ্জন কায়স্থেরা আপনাদের পদবীর সংশ্রব হইতে দাস শব্দটি উঠাইয়া দিয়াছেন—খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তা'ও বলি—একটা উপসর্গকে তাঁহারা এক দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর-একটা উপসর্গকে কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা আর এক দ্বার দিয়া ঘরে ঢোকা'ন্—এইটিই আমার জিজ্ঞাস্য! ব্রাহ্মণের খালি চরণের পদধূলিকে যাঁহারা ডরা'ন, নাইটের বুটমণ্ডিত চরণের পদধূলি দিয়া কোন লজ্জায় তাঁহারা ললাটে তিলক কাটেন—এইটিই আমি বুঝিতে চাই! শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের গাড়ু গামছা বহন করা যদি এতই নীচ কার্য্য হইল, তবে ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা এবং বুট্ পরিষ্কার করা বড় যে একটা ভদ্রজনোচিত কার্য্য তাহার প্রমাণ কি? ফল কথা এই যে, "যার যা তারে সাজে"—ইস্কোএআর পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজকেই সাজে, দাস পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু

পাত করিতেছে—আকের ছিবড়া বা আর কোনো খাদ্য-সামগ্রীর কোনো নিদর্শনই খুঁজিয়া পাইতেছে না। অবশেষে চৌকাটের কাছে কতকগুলা পাদুকা পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে ভাবিল "এতক্ষণে ঠিক্ পাইলাম!" আর তদ্দণ্ডেই রোগীকে বলিল "তোমার নাড়ীর গতি যেরূপ দেখিতেছি—নিশ্চয়ই তুমি পাদুকা ভক্ষণ করিয়াছ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই! ইহা শুনিয়া রোগীর বাড়ির লোকেরা তাহাকে উত্তম-মধ্যম-রূপে পাদুকা ভক্ষণ করাইয়া বিদায় করিল। অনুকরণের এইরূপই বিপরীত গতি।

সন্তানকেই সাজে; কিন্তু অন্যে তাহা লাঠি বাজে—ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরণ কার্য্য হিন্দু সন্তানকে লাঠি বাজে, হীদেন ব্রাহ্মণের পদধূলি ললাটে যেমন ইংরাজ সন্তানকে লাঠি বাজে। * এইটি না বুঝিবার দরুণ অনুকরণ-রূপী চঞ্চল হরিণ দন্তহীন নখহীন ঝিমন্ত দেশী নেকড়েবাঘের হস্ত এড়াইবার

* Esquire উপাধিতে যাঁহারা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন—বাবু উপাধি তাঁহাদের দু'চক্ষের বিষ! ইংরাজ কেরাণীপতি বাঙ্গালি কেরাণীদিগকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করে—এই খেদে তাঁহারা বাবু শব্দের প্রতি এত বীতরাগ! তাঁহারা এতই যদি সূক্ষ্মচর্ম্মী যে সাহেবেরা বাবু শব্দের অপব্যবহার করে বলিয়া সেই খেদে তাঁহারা বাবু শব্দকে আপনাদের নামের কাছ ঘেঁসিতে দিতে নারাজ, তবে দেশশুদ্ধ লোক যে বাঙ্গালির গায়ের হাট্ কোটকে ফিরিঙ্গি পোষাক বলিয়া খোঁটা দ্যায়, তাহার বেলায় তাঁহাদের সে সূক্ষ্ম-চর্ম্ম কোথায় থাকে? তা'র বেলা—দেশশুদ্ধ লোকর লাঞ্ছনা তাঁহারা গায়ে পাতিয়া লইবেন তাহাও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদের মায়া প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারিবেন না—এ যা তাঁহারা বলেন এটা কিরূপ কথা? এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? ইংরাজ কেরাণী-পতিদিগের মত-ই কি তাঁহাদের সর্ব্বারাধ্য লোক মত public opinon? দেশশুদ্ধ লোকের মত কি লোক-মত নহে? দিশী সাহেবেরা যাহাই বুঝুন না কেন—বিলাতি সাহেবেরা public opinion বলিতে আপনাদের দেশের লোক-মতই বোঝেন; তা ছাড়া, ভিন্ন দেশীয় লোকের মত (বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় কেরাণীপতিদিগের মত) ইউরোপীয় কোনো সভ্যজাতির মধ্যে লোক-মত বলিয়া সমাদৃত হয়ও না—হইবেও না। ইংরাজদিগের মধ্যে এমনও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে, বচসা-কালে উচ্চ পদবীস্থ লোক নীচের লোককে কঠোর ভাবে Sir বলিয়া সম্বোধন করে; যথা,—"You hold your tongue sir;" Sir Richards Temple যদি বলেন যে, খানসামাকে ধমক দিবার সময়েও লোকে Sir শব্দ উচ্চারণ করে—অতএব Sir উপাধি অতীব লজ্জাস্পদ উপাধি—ফের যদি আমাকে কেহ Sir উপাধি-যুক্ত শিরোনামায় পত্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকদ্দমা আনিব"—তবে লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? আসল কথা এই যে, খানসামাকে Sir বলাতেও Sir উপাধি কাঁচিয়া যায় না, আর, কেরাণীকে বাবু বলাতেও বাবু উপাধি কাঁচিয়া যায় না।

জন্তু প্রত্যহই নূতন নূতন ফন্দি বাহির হইতেছে অথচ দন্ত-নখ বিশিষ্ট জলজ্যান্ত বিলাতি রাজ-বাঘটা'কে ঘরে ঢোকাবার জন্য লালায়িত। বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরাও আবার তেমনি—যার যা তারে সাজে এ বোধ তাঁহাদের মূলেই নাই; এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, গেরুয়া বসন উদাসীনকেই সাজে—গৃহীকে সাজে না; মাথায় টিকি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই সাজে—বিষয়ী ব্যক্তিকে সাজে না; রুদ্রাক্ষমালা শাক্ত বা শৈব'কেই সাজে আর কাহাকেও সাজে না; তাঁহারা দেশসুদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের সকল বেশ নির্বিশেষে অনুকরণ করিতে প্রস্তুত—যেহেতু তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক আর্য্য!!! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুকরণ—আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই একটি সাধারণ উপসর্গ।

অনুকরণ কী? না দেখাদেখি কার্য্য করা! সাহেবদের দেখাদেখি কার্য্য করা'র নাম সাহেবিআনা। সাহেবদের দেখাদেখি বাঙ্গালিরা কী করেন? যাহা করেন তাহা বুঝাই যাইতেছে;—বাহ্য আকার প্রকার ভাবভঙ্গী চাল্‌চোল্ কথাবার্ত্তার ঢঙ্, এইগুলিই চক্ষে দেখিবার সামগ্রী—তাই, এইগুলিই একজনের দেখাদেখি আর একজন চট্ আদায় করিতে পারে—

বাবু শব্দের মূল বৃত্তান্ত আর কিছু না—Sire শব্দ হইতে যেমন Sir হইয়াছে—বাবা শব্দ হইতে তেমনি বাবু হইয়াছে। তা'র সাক্ষী—হিন্দুস্থানীরা যখন তখন বাবা অর্থে বাবু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। Sire শব্দের অর্থ বাবা বই আর কিছুই না, আর, Sir শব্দ Sire শব্দেরই অপভ্রংশ। এইরূপ, Sir শব্দ এবং বাবু শব্দ উভয়েরই মূল অর্থ যখন একই প্রকার, তখন বাঙ্গালি সাহেবেরা কোন্ যুক্তিতে Sir উপাধিকে স্বর্গের সোপান এবং বাবু উপাধিকে পাতালের সোপান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন—বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মাণ্ডারীন্ উপাধি চীনকেই সাজে আর কোনোজাতিকেই সাজে না; সেখ্ উপাধি মুসলমানকেই সাজে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও সাজে না—পাদ্রি সাহেবকেও সাজে না; বাবু উপাধি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিকেই সাজে—ইংরাজকে সাজে না; Sir উপাধি ইংরাজকেই সাজে বাঙ্গালিকে সাজে না।

বাঙ্গালিরা তাহাই করেন। কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ভাব এবং চরিত্র একজনের দেখাদেখি আর একজন আদায় করিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহা একজনের দেখিয়া আর একজন কেমন করিয়া শিখিবে? সেক্‌স্‌পিয়রের হাতের লেখা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব-রসের অনু-করণ ইংরাজি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান M. A. চূড়ামণিরও অসাধ্য। সেক্‌স্‌পিয়ারের হাতের লেখা প্রত্যক্ষের গোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্তাধীন; আর, সেক্‌স্‌পিয়ারের অন্তর্নিহিত কবিত্বরস প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্ত-বহির্ভূত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কালিদাসও সেক্‌স্‌পিয়ারকে অনুকরণ করিয়া দেশী সেক্‌স্‌পিয়র হ'ন নাই, সেক্‌স্‌পিয়রও কালিদাসের অনুকরণ করিয়া বিলাতি কালিদাস হন নাই; নেল্‌সন্‌ও নেপোলিয়নকে অনুকরণ করিয়া জলপথের নেপোলিয়ন হ'ন নাই, নেপোলিয়নও নেল্‌সন্‌কে অনুকরণ করিয়া স্থলপথের নেল্‌সন্ হ'ন নাই; রামমোহন রায়ও লিউথরকে অনুকরণ করিয়া দেশী লিউথর হ'ন নাই—লিউথরও রামমোহন রায়কে অনুকরণ করিয়া বিলাতি রামমোহন রায় হ'ন নাই। যা'র যা তারে সাজে—সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব সেক্‌স্‌পিয়রকেই সাজে, কালিদাসের কবিত্ব কালিদাসকেই সাজে (সুবিখ্যাত Emerson তাই বলিয়াছেন 'Shakespeare never will be made by the study of shakespeare' সেক্‌স্‌পিয়ার পড়িয়া কোনো জন্মেই কেহ সেক্‌স্‌পিয়র হইতে পারিবেন না); নেপোলিয়নের যুদ্ধ-কৌশল নেপোলিয়নকেই সাজে, নেল্‌সনের যুদ্ধ কৌশল নেল্‌সন্‌কেই সাজে; একজনের অনুকরণ আর এক জনকে সাজে না—একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। Museকে সাড়ী পরা সাজে না; (কোনো বঙ্গ কবি যদি মহারাজ-হংসের (Swan-এর)

কণ্ঠের সহিত রূপসীর কণ্ঠের তুলনা দেন, তবে তাহারই নাম সরস্বতীকে গৌন্ পরানো); পদ্ম-মৃণালের আগায় গোলাপ ফুল সাজে না, গোলাপের ডালে পদ্ম-ফুল সাজে না,—যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বল পূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ।

অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে না, সে বিষয়ে যৎস্বল্প একটি কথা এখনো আমাদের বলিবার আছে—সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন; আর মনে কর যে, প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন; সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় একটি চিত্র তাঁহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপস্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—আদর্শ,এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—তাহার প্রতিকৃতি; এ ভিন্ন—দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না; তাহা না বলিতে পারিবার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই—একটার দেখা-দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া ওঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র-হইতে ভাব লইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর

এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে সেরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আর আকাশ ব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে; ভাব মানসিক পদার্থ—আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না। অতএব, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ না যে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতরে পুরিয়াছেন; উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল;—তাঁহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল; যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকসিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই অভিব্যক্ত হইল; কাজেই ভাব-গ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু আর বাহির হইতে ভাব-গ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এক নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে যখন শত সহস্র ফরাসীস্ সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিবাহন করিয়া শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিল, তখন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, যেমন নেপোলিয়ান—তেমনি তাঁহার ফরাসীস্ সৈন্য; সে সৈন্য সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুহূর্ত্তেরই ভুঁইফোঁড় বীর; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, তাহারা গোড়া হইতেই বীর; যে

বীরভাব গোড়া হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে পুঁজি করা ছিল, নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল—এই বই আর কিছুই নহে। যেরূপ বীর-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং তোপের মুখে একপদ অগ্রসর হইলেন, সেইরূপ অন্তর্নিহিত বীরভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা তোপের মুখে শত পদ অগ্রসর হইল; নেপোলিয়নের দেখাদেখি তাহারা তাহা করেও নাই—করিতে পারিতও না; কেন না, তাহারা যখন তোপের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী নকল করিবার অবকাশ তাহাদের কোথায়? নেপোলিয়নের সৈন্যেরা যদি নেপোলিয়নের ধরণে ওয়েষ্ট্-কোটের পকেটে হাত দিয়া সমাহিত-ভাবে দাঁড়াইত, নেপোলিয়নের ধরণে চাপ-চাপ নস্য লইত, নেপোলিয়নী ঢঙের কোর্ত্তা পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত যে, তাহারা নিজের কোনো আন্তরিক ভাবের আবেগে না—খালি-কেবল নেপোলিয়নের দেখাদেখি কার্য্য করিতেছে; এইরূপ কার্য্যই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। এরূপ অনুকৃতি-পরায়ণ সৈন্যদিগের কোনো কার্য্যের মধ্যেই বীরত্বের প্রতিকৃতি সহস্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে, আন্তরিক ভাবের পুঁজি হইতে যে কার্য্য উৎসারিত হয়, তাহা দৃষ্ট-আদর্শের অবিকল অনুরূপ হইলেও তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। অন্তরে ভাবের খাঁকৃতি এবং বাহিরে চটক এই পিতা মাতা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুকৃতি। মোটামুটি সংক্ষেপে বলিতে হইলে—ভাব-মূলক কার্য্য যদি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তাহা প্রতিকৃতি শব্দের বাচ্য, আর, ভাব-শূন্য কার্য্য যদি যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভাবে কৃত হয় তবে তাহাই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। অনুকৃতির ললাটে এই বাক্যটি ছাপ দেওয়া আছে যে Letter

killeth, মৌখিক শব্দ—বিনাশের পথ; এবং প্রতিকৃতির ললাটে এইরূপ ছাপ দেওয়া আছে যে Spirit giveth life, আন্তরিক ভাব জীবনের উৎস। মূলেই যাঁহার সুরবোধ নাই তিনি যত বড়ই ওস্তাদের নিকটে গান শিখুন্ না কেন—শিখিবার মধ্যে তিনি কেবল ওস্তাদের মুদ্রা-দোষটিই শেখেন—যেহেতু তাহা তাঁহার চক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়; সুর-বোধ যদি চক্ষে দেখিবার বস্তু হইত তবে ওস্তাদের দেখাদেখি যেমন করিয়া তাঁহার মুদ্রা-দোষ জন্মিয়াছে তেমনি করিয়া তাঁহার সুরবোধ জন্মিতে পারিত। একজন উদ্যানের মালী দিবা-রাত্রি ফুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য্য যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে হয় তো জানে না; একজন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো নাম ধাম কিছুই জানেন না—অথচ ফুলটি দেখিবামাত্র তিনি হয় তো তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যা'ন; মালীটা যদি কবির সেই বিমোহিত অবস্থার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিলেই কবির সৌন্দর্য্য-রস-বোধটী স্বীয় মনোমধ্যে আঁকড়িয়া পাইত—তবে পৃথিবীতে আর কবি ধরিত না! অতএব বীরত্বই হউক্, রসবোধই হউক্, প্রীতিই হউক্ ভক্তিই হউক, নয়নের অপ্রত্যক্ষ অন্তঃকরণের যে কোনো ভাবই হউক্, তাহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে অনুকরণের ঝিনুকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে কি? না সহবাস, দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে তাহাই উদ্বোধিত হয়, যাহা মুকুলিত আছে তাহাই বিকসিত হয়, যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। ভস্মে আহুতি দিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে না—অগ্নিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা যিশু অতীব একটি সারবান্ বাক্য উদীরণ করিয়াছেন, সেটি এই;—"Unto every one that hath shall be given

and he shall have abundance; but from him that hath not shall be taken away even that which he hath"—যাহার আছে সে আরো পাইবে—একগুণের জায়গায় শতগুণ পাইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে"; এ কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার সাক্ষী—যৎকিঞ্চিৎ যাহার সুরবোধ আছে সে ওস্তাদের সাক্‌রেতি করিলে আরো অধিক পরিমাণে সুরবোধ উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু যাহার মূলেই সুরবোধ নাই সে ওস্তাদের সাক্‌রেতি করিলে উপার্জ্জন করিবার মধ্যে কেবল মুদ্রা-দোষ উপার্জ্জন করিবে—গুণ উপার্জ্জন না করিয়া দোষ উপার্জ্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই পুঁজি—সে যদি ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়, তবে সে—ধন উপার্জ্জন না করিয়া ঋণ উপার্জ্জন করিবে; পূর্ব্বে তাহার টাকা না থাকার দুঃখ যেমন ছিল—আর এক দিকে—ঋণ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-সুখটিও তাহার ঘুচিয়া যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্তরে ভাবের পুঁজি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আবশ্যক; বিদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি উপার্জ্জন করিতে হইলে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতিই তাহার একমাত্র গোড়ার বনিয়াদ; কেন না, জল যেমন জল আকর্ষণ করে, টাকা যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করে; তা ভিন্ন, ভাবের খাঁকতি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যে, মাতার স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শৈশবকাল হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাণের অভ্যন্তরে দিন দিন ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর-রূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া সকল দেশেরই ভদ্রসমাজে সদ্‌ভাব এবং সদাচারের একটানা স্রোত ক্রমাগতই

প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে। বাঙ্গালী-সন্তান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার চতুর্দ্দিক্ হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং সমাজের ব্যবস্থা-প্রণালী যদি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রযত্নে গড়িয়া লইতে হইত, তবে মাতৃভাষাও কোনো দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত না, আর, ভদ্র সমাজও কোনো দেশে মস্তক তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে,:বঙ্গ সন্তানের শৈশব কাল হইতে অন্যূন আঠারো বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা উপার্জ্জনের কাল; সেই মুখ্য সময়টির মধ্যে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার যাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা গাড়িতে না পায়,—সেই মুখ্য সময়টিতে যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াও স্বদেশীয় ভালো কোনো কিছুরই মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তাঁহারা যে, কিরূপে বিদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিবেন—তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, যাহার আছে সে আরো পায়, কিন্তু যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও যায়; তা'র সাক্ষী—স্বদেশের ভাষা-জ্ঞান এবং ভদ্র রীতি-নীতির সংস্কার গোড়া হইতেই যাঁহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে পুঞ্জীভূত আছে তাঁহারা বিদেশে গেলে সেখানকার সার সার বস্তু-গুলি আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করেন—বিজ্ঞান শিল্প কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য তেজস্বিতা মহত্ব পরানুকরণে বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন; পূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদের আছে তাঁহারা আরো পা'ন; কিন্তু যাঁহাদের গোড়া থাঁকৃতি—স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মর্ম্মরসের আস্বাদ যাঁহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও না, তাঁহারা শিক্ষার্থে বিদেশে গেলে হিতে-বিপরীত করিয়া বসেন; যাঁহা-

দের নাই তাঁহাদের যাহা আছে তাহাও যায়। তাঁহাদের আপনাদের দেশের ভদ্রাভদ্রের তুলাদণ্ড যদি তাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিত, তবে তাহা দিয়া তাঁহারা অন্য দেশের ভদ্রাভদ্র তৌল করিয়া দেখিয়া—তাঁহাদের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই কেবল তাঁহারা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু সে তুলাদণ্ড যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীয় রীতি-নীতির ভালমন্দ যে তাঁহারা কিরূপে বোধায়ত্ত করিবেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। ফলেও তাই দেখা যায় যে, অপক্কবুদ্ধি লঘুচিত্ত বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার সু, কু এবং চলন-সই, এই তিন প্রকার বিরোধী সামগ্রীকে তিনি একাসনে বসাইয়া সু'য়ের অপমান করেন, কু'য়ের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবর্দ্ধককাচের মধ্য দিয়া তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয়কে তাল-প্রমাণ বড় দেখেন। * জ্ঞান-শিক্ষার জন্য

---

* বাঙ্গালি সাহেবেরা যে, বাস্তবিকই ইংরাজী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি তালকে তিল দেখেন, তাহার প্রমাণ সেদিনকার সভাস্থলে হাতে হাতে পাওয়া গেল। একজন বক্তা উঠিয়া বলিলেন "মেষের চামড়া মেষকে সাজে—বৃকের চামড়া বৃককে সাজে; বাঙ্গালিরা আগে বৃক হো'ন্ তবেই বৃকের চামড়া তাঁহাদের গাত্রে মানাইবে: আগে তাঁহারা সাহেবদের মতো তেজী পুরুষ হো'ন তবেই তাঁহাদের গাত্রে সাহেবি ঢঙের কোর্ত্তা মানাইবে"—যেন হ্যাটকোট তেজস্বিতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ! পুরাণের ভীমসেন তো আর মেষ ছিলেন না—বৃকোদর তিনি বৃকই ছিলেন; তিনি কি ইংরাজি ঢঙের কোট পরিতেন? হ্যানিবাল্ কি রোমান ঢঙের পরিচ্ছদ পরিতেন? পরানুকরণ তো আর তেজিয়ান্ বীরপুরুষের লক্ষণ নহে—তাহা লেজিয়ান্ বীর হনুমানেরই লক্ষণ! তাহার সাক্ষী—ইংরাজিতে Aping (হনুকরণ) বলিয়া যে একটি শব্দ আছে তাহা আপনিই আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে! ইংরাজি তিল'কে যাঁহারা তাল দেখেন আর বাঙ্গালি তালকে যাঁহারা তিল দেখেন তাঁহারাই ইংরাজি ঢঙের কোর্ত্তাকে সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, আর, দোধুয়মান সহজশোভান ধুতিচাদরের যেমন একতরো অকৃত্রিম শোভা তাহার প্রতি তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ।"

তাঁহারা বঙ্গভূমি হইতে ইঙ্গভূমিতে প্রয়াণ করেন—ঢঙ শিক্ষা করিয়া তাঁহারা ইঙ্গ হইতে বঙ্গে ফিরিয়া আসেন! এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশে সাহেবিআনার সূত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জের চলিতেছে। অতঃপর সাহেবিআনা রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া অচিরাৎ তাহার একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আনুপূর্ব্বিক নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের যন্ত্রণা হইতে আপনাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি—আপনারা সুস্থির হউন।

ইতিপূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্য-পন্থী চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—সাহেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ঔষধ জাগিতেছে, এখন তাহাকে নারিকেলের শাঁসের মতো চাঁচিয়া বাহির করিয়া লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিগের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে; সেগুলিকে এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এইটিই হ'চ্চে সাহেবি উপকরণ-গুলির মাতৃক সত্ত্ব কিনা mother tincture; এই মাতৃক সত্ত্বটি জলে গুলিয়া গুলিয়া তাহার তেজ কমানো চাই—নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্কর। এই ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার যেরূপ মহত্ত্ব এবং তেজস্বিতা তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমার মধ্যে পা বাড়াইতে সাহসী হয় না; তাহার সাক্ষী—ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট হইতে দার্শ-নিক তত্ত্বজ্ঞান আদায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না, কিন্তু জর্ম্মানদিগের কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গী, রকম-সকম, আপনাদের মধ্যে চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না; জর্ম্মানেরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আদায় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

হইবে না, কিন্তু ইংরাজদিগের আকার-প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে প্রাণান্তেও চাহিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ। † বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাব ভঙ্গীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া ল'ন,

---

† নিতান্ত কাছাকাছি-দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে সমান, এই জন্য তাহাদের মধ্যে বেশ-ভূষাদির অনুকরণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে; কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব হইতে সমান কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি; তাহা হইলেই এখানকার এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে আর কোনো গোল থাকিবে না। "নাচের উপযোগিতা" এই ভাব হইতে ইংরাজ এবং ফরাসীস্ উভয় জাতিরই মজলীষী ঘাগ্‌রা এবং কোর্ত্তাদির আঁটা সাঁটা সাজ উদ্ভূত হইয়াছে; উভয় জাতির মনের ভাব এইরূপ সমান হওয়াতে ইংরেজেরা পারিস্ ঢঙ্ অনুকরণ করিলে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ একটি কথা বলিবার থাকে যে, সেরূপ ঢঙ্ তাহাদের নিজের মনের ভাবেরই প্রতিকৃতি। পক্ষান্তরে "নাচের উপযোগিতা" এ ভাবটী বাঙ্গালিদের মনে কোনো পুরুষেই নাই—এ অবস্থায় বাঙ্গালিরা যদি উহাদের দেখাদেখি ঐরূপ ঢঙের অনুকরণ করেন. তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে কাহারো এরূপ কথা বলিবার জো থাকে না যে. সে ঢঙ্ তাঁহাদের মনের ভাবের প্রতিকৃতি; যেহেতু তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তেমনি বাঙ্গালিদের সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন—"জল খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা মিষ্ট দ্রব্য জল পিপাসার উদ্দী-পক); পক্ষান্তরে—ইংরাজদের শুকনা বিস্কুট আদি ভক্ষ্য সামগ্রী "মদ-খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা সেইরূপ সামগ্রীই মদের চাটের উপযোগী)। এ অবস্থায় —বাঙ্গালিরা যদি সন্দেশ আদির পরিবর্ত্তে বিস্কুট-আদির ব্যবহার আপনাদের মধ্যে চালা'ন্—তাহা হইলে তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় উদাহরণটী অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা।

তবে তাঁহারা সাহেবিআনা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই আমরা বলি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ।

উপসংহার কালে "মধুরেন সমাপয়েৎ" এই বচনটি আমার মনের সম্মুখে আসিয়া দুই হাত দুইদিকে প্রসারণ পূর্ব্বক পথ-রোধ করিয়া দণ্ডায়মান—ইহাকে আমি লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনার বিপক্ষে আমি অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দোঁহার সপক্ষে একটা কথা যাহা আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভয়ের সাত-খুন-মাপ! সেই কথাটি বলিয়াই আমি প্রস্তাব সাঙ্গ করিতেছি। আর্য্যামিকে আমি এই জন্য ভাল বলি যেহেতু তার গর্ব্ভে আর্য্যোচিত কার্য্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে; আর সাহেবিআনাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গৃহাভ্যন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্য্যামির গর্ব্ভ হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন সে ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে; তাহার পরে আর্য্যোচিত কার্য্যের ঔরসে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার গর্ব্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এ সভ্যতার গাত্রে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্য্যদিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুইই একাধারে সম্মিলিত হইবে—এইটি যে দিন হইবে সেইদিন ভারতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইবে। এইখানেই শান্তিঃ শান্তিঃ।

সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা

আমি অদ্য একটি অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-খানি হস্তে করিয়া এখানে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহার নাম "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।" একে তো চিকিৎসা মাত্রই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ; তাহাতে আবার কবিরাজি চিকিৎসা—যাহার সহিত উনবিংশশতাব্দীয় বিজ্ঞান-রশ্মির জন্মেও দেখা-সাক্ষাৎ নাই! আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা—যাহার গহন অরণ্যে মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দিশা-হারা হইয়া যা'ন! একে চিকিৎসা—তাহাতে কবিরাজি চিকিৎসা—তাহাতে আবার সামাজিক চিকিৎসা! একে রজনী দ্বিপ্রহর—তিথি তায় অমাবস্যা—ঋতু তায় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা! কিন্তু হইলে হইবে কি—আমি এখন মাঝ-গঙ্গায় উপস্থিত! আমা হইতে এ-পারও যত দূর, ও-পারও তত দূর! এখন আমার পক্ষে এগোনও যা—পিছোনোও তা; বিপদ দুয়েতেই সমান! এসময়ে পিছোনো লাভে-হইতে কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া! এখন কর্ত্তব্য কি? ঢেউ দেখিয়া লা ডুবানো কর্ত্তব্য—না শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া থাকিয়া গন্তব্য কূলের দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য? এগোনোই কর্ত্তব্য—

তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অতএব তাহাই করা যা'ক্—এগোনো যা'ক্।

কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা আমার বলিবার আছে; তাহা এই যে, ডাক্তারি বিদ্যা স্বতন্ত্র, আর, কবিরাজি বিদ্যা স্বতন্ত্র! ডাক্তারি বিদ্যার গোড়াতেই শবদেহ-পরীক্ষা; কবিরাজি বিদ্যার গোড়াতেই শরীর-মনের সম্বন্ধ-পর্য্যালোচনা। ডাক্তারি মতে—আগে শরীর, পরে মন; কবিরাজি মতে—আগে মন,পরে শরীর। কবিরাজি-শাস্ত্রের অন্তরের কথা এই যে সহস্র মৃত শরীর পরীক্ষা করিলেও জ্যান্ত শরীরের প্রাণ-প্রধাণ নিগূঢ় তত্ত্বগুলির অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না; কেননা, শরীরের সহিত যেখানে মনের সংশ্লেষ, সেইখানেই প্রাণের বসতি; কাজেই—প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে প্রাণের সেই-বসতি-স্থানে—শরীর মনের সন্ধি স্থানে—মনোনিবেশ করা অন্বেষ্টু ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়াতেই তাই ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ—কথাটা কিছু ঘোরালো রকমের! তাহা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়—যেন, শামুকের নস্যকোষের মধ্য হইতে এই মাত্র তাহা গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! কিন্তু তাহার স্থূল তাৎপর্য্য যার-পর-নাই সহজ; তাহা আর কিছু না—মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ। অনতিপরেই আপনারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সে-যে ত্রিগুণ, যাহাকে আপনারা এত ভয় পাইতেছেন, তাহা আর কিছু না—কেবল মনের তিনটি মুখ্যতম বৃত্তি; ত্রিদোষ আর কিছু না—সেই তিনটি মুখ্যতম মনোবৃত্তির সহানুপাতী (Parrallel-running) তিনটি শারীরিক মূল-ধাতু। এই দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপনই কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়া'র কাহিনী। গোড়াতেই আমি এই গোড়া'র কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি; কেননা, সুর না বাঁধিয়া যন্ত্র-বাদন

করা, আর, প্রবন্ধের গোড়া না বাঁধিয়া ডালপালা বিস্তার করা—দুইই সমান! তাহা একপ্রকার হত্যাকার্য্য—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা ক্ষান্ত হওয়াই ভাল! আর একটা কথা এই যে, গোড়া'র কথা গোড়ায় না বলিয়া আমি যদি মাঝখানকার কোনো-একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোড়া-পত্তন করি, তাহা হইলে হইবে এই যে, আমি একভাবে এক কথা বলিব—আপনারা পাঁচজনে তাহা পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার পাঁচ রকম অর্থ করিবেন; লাভে লইতে আমার প্রকৃত মন্তব্যটি মাঠে মারা যাইবে।

কিন্তু এটা আপনারা স্থির জানিবেন যে, গোড়া'র কাহিনীটি এক প্রকার Rubicon নদী! একবার জো-শো করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে তাহার ওপারে পৌঁছিতে পারিলেই—আর আপনাদের কোনো ভাবনা চিন্তা থাকিবে না! সেথান হইতে আপনারা তর্-তর্ করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন—মনের আনন্দে!

কবিরাজি চিকিৎসা'র গোড়া'র কাহিনী যে, কী, তাহা আমি গোড়াতেই ইঙ্গিত করিয়াছি; কী? না ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা। ত্রিগুণ কী? না সত্ত্বরজস্তমো; ত্রিদোষ কী? না বাত পিত্ত কফ।

প্রস্তাবিত গোড়া-বন্ধন-কার্য্যের দুইটি স্তর; প্রথম স্তর—ত্রিগুণের গুণ-পরিচয়; দ্বিতীয় স্তর—ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ-নিরূপণ; এই দুইটি স্তরের গঠন-কার্য্য কোনো মতে আমি আমার হস্ত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধনের দায় হইতে এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাই, এবং সেই দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপরে ভর করিয়া—বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনা কার্য্যে নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্ত হই।

প্রথম; ত্রিগুণের গুণ-পরিচয়। ত্রিগুণের নাম শুনিয়া আপনারা হয়

তো মনে করিতেছেন—"না জানি কি একটা ত্রিশূলধারী দার্শনিক বিকট-মূর্ত্তি আসিতেছে—তাহার সে বিরূপাক্ষ-দৃষ্টিতে একবার সে আমাদের মুখের পানে খট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়া যাইবে!" কিন্তু ত্রিগুণ বেচারীকে আপনারা একবার চক্ষে দেখিলেই, আপনাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া—উণ্টা তখন আপনারা আমাকে এরূপ না বলিলে বাঁচি যে, "এই তোমার সত্ত্বরজস্তমোগুণ—এ'র জন্য এত তুমুল কাণ্ড! আমাদের স্তন্যপানের বয়স হইতেই এর সঙ্গে তো আমরা একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি; এমন কি—এ'র সঙ্গে মাতৃগর্ব্ভ হইতে একত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি বলিলেই হয়!" এই দেখুন্—ত্রিগুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্র-বেশে আপনাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে;—তমোগুণ কী? না বহির্জগতে রাত্রি এবং অন্তর্জগতে নিদ্রা; রজোগুণ কী? না বহির্জগতে দিবা এবং অন্তর্জগতে কর্ম্ম চেষ্টা; সত্ত্ব-গুণ কী? না বহির্জগতে সন্ধ্যা এবং অন্তর্জগতে চিন্তা; তাহার মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যার সহিত তত্ত্বচিন্তা এবং ঈশ্বরারাধনা আর সায়ংসন্ধ্যার সহিত আরাম-চিন্তা এবং ক্রীড়া কৌতুক সবিশেষ উপযোগী। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই ত্রিগুণ-চক্র; সংক্ষেপে—গুণ বৃত্ত, বৃত্ত—কি না চক্র। এতো সকলেরই দেখা কথা যে, চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা অন্তর্জগতে বৃত্তের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি-শব্দের বাচ্য। বাহিরে যেমন দিন রাত্রি—অন্তরে তেমনি মনোবৃত্তি—উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বহির্জগতে যখন রাত্রি আগমন করে, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা আগমন করে; বহির্জগতে যখন চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়া অরুণ-সারথি আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া ধ্যান আবির্ভূত হয়; বহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত হইয়া মধ্যাহ্ন-দিবা আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া কর্ম্ম চেষ্টা আবির্ভূত হয়, এইরূপে

নিদ্রা চিন্তা এবং চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের বাচ্য; মনুষ্যের আর আর যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, সমস্তই ঐ তিনটি মূল-বৃত্তির ডাল-পালা; যেমন চিন্তার ডালপালা—কল্পনা স্মৃতি যুক্তি ইত্যাদি; চেষ্টার ডালপালা—প্রযত্ন উদ্যম অধ্যবসায় ইত্যাদি; নিদ্রার ডালপালা—আলস্য অবসাদ বিলাস ইত্যাদি। গুণ-বৃত্তই—ত্রিগুণ-চক্রই—মনের তিনটি মূল-তম বৃত্তি; আর, সে তিনটি বৃত্তি পরস্পরের সহিত সহস্র জড়াজড়ি করিয়া থাকিলেও তিনের এ'র ও'র তা'র মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আমরা কিছুমাত্র বাধা অনুভব করি না। চেষ্টার সঙ্গে যদিচ কথনো বা চিন্তা জড়ানো থাকে [যেমন কর্ম্ম চেষ্টার সঙ্গে অন্ন চিন্তা] কথনো নিদ্রা জড়ানো থাকে [যেমন পরিশ্রান্ত পাখা-বেহারার পাখাটানার সঙ্গে নিদ্রা]; নিদ্রার সঙ্গে যদিচ কথনো বা চিন্তা জড়ানো থাকে [যেমন চিন্তানুরূপ স্বপ্ন], কথনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে [যেমন ঘুমের ঘোরে কথাকওয়া অথবা যাহা তদপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য—ঘুমের ঘোরে চলা-ফেরা], চিন্তার সঙ্গে যদিচ কথনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে [যেমন দুরূহ বিষয়ে মনঃসংযোগ], কথনো বা নিদ্রা জড়ানো থাকে [যেমন অন্যমনস্কভাবের দিবা-স্বপ্ন]; বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে যদিচ এইরূপ ঘনিষ্ঠ মাথামাখি-ভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তিনের ইতরেতর-প্রভেদ সুস্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি করি, আর, সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি বলিয়াই তিনকে পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই। এই গেল ত্রিগুণের গুণ পরিচয়।

দ্বিতীয়; ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ-নিরূপন। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা, এই তিনটি মূল মনোবৃত্তির সহিত ক্রমান্বয়ে বাত পিত্ত এবং কফ এই তিনটি দৈহিক মূল উপকরণের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার সাক্ষী—দেশশুদ্ধ সকল লোকেই জানে যে, শ্লেষ্মা বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে,

আলস্য বাড়ে এবং গা মাটি-মাটি করে ; পিত্ত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ছট্‌ফটানি বাড়ে—চেষ্টা বাড়ে ; বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে—কল্পনা বাড়ে।

এখন কথা হ'চ্চে এই যে, শরীরের যেমন তিনটি প্রধান উপকরণ—বাত পিত্ত কফ, সমাজেরও তেমনি বাত পিত্ত কফ আছে ; কী ? না স্থিতির দল, গতির দল, এবং স্থিতির দল। স্থিতির দল সমাজের শ্লেষ্মা ;— শ্লেষ্মা বলো, জল বলো, রস বলো, মেদ বলো, সবই বলিতে পারো কেবল ভাবটা মনে রাখিলেই হইল ; ভাবটা আর কিছু না—নরম ঠাণ্ডা স্থূল এবং ভারভার। বৈদ্য শাস্ত্রে শ্লেষ্মা তমোগুণ প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছলঃ শীতলস্তথা তমোগুণাধিকঃ।" গতির দল সমাজের পিত্ত ; পিত্তই বলো আর অগ্নিই বলো—একই কথা ; ভাব আর কিছু না-গরম উদ্ধত এবং চঞ্চল। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর ; যথা,—

"নখলু পিত্তব্যতিরেকেনান্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তস্য।"

গতির দল সমাজের পিত্ত—সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু ; সৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে ঐশ্বরিক সৃষ্টি নহে কিন্তু মানসিক সৃষ্টি—ভাবের প্রবর্ত্তনা ; যেমন কবির কাব্য রচনা একতরো সৃষ্টি ; শিল্পীর শিল্প রচনা আরেক-তরো সৃষ্টি, যদি তাহা শিল্পীর অন্তরের ভাব হইতে উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে ; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নূতন নূতন মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত তৃতীয় আর এক-তরো সৃষ্টি—এ সৃষ্টি ঐশ্বরিক সৃষ্টির উপরে একপ্রকার দাগা বুলানো। সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি সৃষ্টি বাতুলের প্রলাপ-দর্শন, কেননা তাহার সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক অতীব অল্প, তাহার বারোআনা অংশ দ্রষ্টার মনঃসম্ভূত। জগৎ সৃষ্টি ঐশ্বরিক ব্যাপার,—তাহার কথা এখানে হইতেছে না ; এখানে কেবল মানসিক সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে যে, সৃষ্টির দল সমাজের

বায়ু। স্থষ্টি কি না ভাবের প্রবর্ত্তনা। বায়ু যেহেতু দেহাশ্রিত সমস্ত ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক, এই জন্য আমি বলি যে, বায়ু স্থষ্টিশীল; স্থষ্টিশীল কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল।

বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে বায়ু প্রবর্ত্তনাশীলও বটে, গতিশীলও বটে, তাহার সাক্ষী—"দোষধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ" "নেতা" কিনা প্রবর্ত্তনা শীল, "শীঘ্রঃ" কি না গতিশীল। এই স্থানটিতে বৈদ্যশাস্ত্রের সহিত আমার মতের বারো আনা ঐক্য, চারি আনা অনৈক্য,—বৈদ্য-শাস্ত্রে বলে "বায়ু প্রবর্ত্তনা শীল এবং গতিশীল, দুইই"; আমি বলি যে, বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্ত গতিশীল। বায়ুকে এখানে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলিবার প্রধান একটি কারণ এই যে, এখানে ধাতবিক বায়ুর কথা হইতেছে—ভৌতিক বায়ুর কথা হইতেছে না; ধাতবিক বায়ু কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে Nervous fluid। এটা আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহাকে বলে "বায়ু-প্রধান ধাতু" ইংরাজি ভাষায় তাহারই নাম Nervous temperament। ধাতবিক বায়ুর নানা প্রকার গুণ আছে—ইহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, আর, তাহার সেই নানাবিধি গুণের মধ্যে একটি গুণ যে, গতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ইহাও আমি অস্বীকার করিতেছি না—আমি বলিতেছি কেবল এই যে, চলা-ফেরা গুণটি ধাতবিক বায়ুর এমন কোনো একটা অনন্য-সাধারণ গুণ নহে যাহা তাহার স্বজাতির মধ্যে আর কাহারো নাই; রক্তও তো চলে ফেরে; ধাতবিক বায়ুর, অর্থাৎ Nervous fluid-এর, বিশেষত্বের পরিচয় লক্ষণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আপনি চলা-ফেরা নহে কিন্তু অন্যকে চলানো-ফেরানো। শরীরাভ্যন্তরে যেখানে যতপ্রকার গতি আছে (যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচ-বিকোচ, নাড়ীস্পন্দন, হস্তপদ পরিচালন ইত্যাদি), সমস্তেরই মূলপ্রবর্ত্তক ধাতবিক বায়ু (কি না Nervous fluid)। এইটি এখানে

সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে গতি স্বতন্ত্র এবং গতির প্রবর্ত্তনা স্বতন্ত্র; গতি অশ্বের ধর্ম্ম—প্রবর্ত্তনা সারথির ধর্ম্ম; অতএব এটা যখন স্থির যে, ধাতবিক বায়ুর ভেদ-পরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্তু গতির প্রবর্ত্তনা, তখন বায়ুকে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

বায়ুকে আমি বলি প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্তকে আমি বলি গতিশীল। কেন? না যেহেতু বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে "পিত্তব্যতিরেকেনান্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে" পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর; পিত্ত-রূপী অগ্নিকে কে উত্তেজিত করে? না বায়ু; যেহেতু বৈদ্য-শাস্ত্রমতে বায়ু দেহাশ্রিত যাবতীয় ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক। তবেই হইতেছে যে, বায়ু উত্তেজক—অগ্নি উত্তেজিত; বায়ু প্রবর্ত্তক—অগ্নি প্রবর্ত্তিত; বায়ু চালক—অগ্নি চালিত। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, গতিশীল কে? যে চালায় সে গতিশীল—না যে চলে সে গতিশীল? সারথি গতিশীল না অশ্ব গতি শীল? বায়ু প্রবর্ত্তক সুতরাং সারথি স্থানীয়—পিত্ত প্রবর্ত্তিত সুতরাং অশ্ব স্থানীয়; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, পিত্ত গতিশীল, বায়ু সৃষ্টিশীল—কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল।

বায়ুকে আমি যে কারণে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলি, সেই কারণেই আমি তাহাকে রজো-গুণ-প্রধান না বলিয়া সত্ত্বগুণ-প্রধান বলি। পাতঞ্জল দর্শনে, "জগৎ ত্রিগুণাত্মক" এই সহজ কথাটিকে একটু আড় করিয়া এইরূপ ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে যে, জগৎ "প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীলং" অর্থাৎ প্রকাশ-শীল ক্রিয়াশীল এবং স্থিতি-শীল। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশ-শীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল বা গতিশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রকাশ-শীল কে? না চক্ষু; সুতরাং চক্ষু সত্ত্বগুণ প্রধান; গতি-শীল কে? না পদ, সুতরাং পদ রজোগুণ-প্রধান। ঘোড়া কাণা হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার পা-চারিটা সু পটু থাকা চাই-ই চাই; সারথির কিন্তু ঠিক্ তাহার বিপরীত।

—সারথীর পা খোঁড়া হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার চক্ষু দুটা সতেজ থাকা চাই-ই চাই। এই সহজ বৃত্তান্তটি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, চক্ষু-ব্যতিরেকে—প্রকাশ-ব্যতিরেকে—প্রবর্ত্তনাকার্য্য কোনো-মতেই চলিতে পারে না; আর এটা যখন স্থির যে, প্রকাশ ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তনা কার্য্য চলিতে পারে না, তখন বায়ুকে প্রবর্ত্তনা-শীল বলিলে তাহাকে যে প্রকারান্তরে প্রকাশাত্মক অথবা যাহা একই কথা—সত্ত্বগুণ-প্রধান বলা হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বায়ুর (অর্থাৎ Nervous fluid এর) প্রকাশকতা গুণটি পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে মূলেই যে জানা ছিল না, এত-টা আমি বলিতে সাহসী নহি; তবে—এটা স্থির যে, পূর্ব্বতন কালে তাহা এখনকার মতো এরূপ সবিস্তরে এবং সুপরিষ্কৃত ভাবে জানা ছিল না, তাই শাস্ত্রকারেরা বায়ুকে রজোগুণ-প্রধান বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান অব্দের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অকাট্য-রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধাতবিক বায়ু (Nervous fluid) সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক চেতনা-কার্য্যের নির্ব্বাহ-কর্ত্তা—সুতরাং প্রকাশাত্মক, অথবা যাহা একই কথা—সত্ত্বগুণ-প্রধান। বলিতেছি বটে ধাতবিক বায়ু প্রবর্ত্তনা শীল এবং প্রকাশাত্মক; কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ধাতবিক বায়ু চেতন-ধর্ম্মী। শাস্ত্রে আছে যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক হইলেও তাহা জড় পদার্থ বই আর কিছুই নহে—চেতন-পদার্থ নহে। চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্রের নিজের কিরণ নহে কিন্তু সূর্য্যকিরণেরই প্রতিবিম্ব, তেমুনি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই সিদ্ধান্ত এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ তাহার নিজের স্বাধীন প্রকাশ নহে—তাহা আত্মার অনুপ্রকাশ-মাত্র। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীল বা সৃষ্টিশীল এবং তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধান।

পিত্তকে আমি যে অর্থে গতিশীল বলি, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়া

ঢুকিয়াছি; আমি বলিয়াছি যে, বায়ু প্রবর্ত্তক, অগ্নি প্রবর্ত্তিত; আর, বৈদ্য শাস্ত্রের মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর। আমি দেখাইয়াছি যে, বায়ু সারথি-স্থানীয়, পিত্ত অশ্ব-স্থানীয়। পিত্ত অশ্ব স্থানীয় কাজেই গতিশীল; গতিশীল যখন—তখন কাজেই তাহা রজোগুণ-প্রধান; কেননা শাস্ত্রের মতানুসারে গতিশীলতা রজোগুণেরই ধর্ম্ম। তা ছাড়া—পিত্তের প্রকোপ হইলে নাড়ীর যেমন প্রচণ্ড বেগাতিশয্য হয়, এমন আর কিছুতেই নহে; অতএব "ফলেন পরিচীয়তে" এ কথা যদি সত্য হয় তবে পিত্তাবিষ্ট নাড়ীর দ্রুত-বেগ আমারই কথা'র পোষকতা করিয়া মুখে না বলুক্—কাজে দেখাইতেছে যে, পিত্ত গতি-শীল এবং রজোগুণ-প্রধান।

শ্লেষ্মা যে তমোগুণ-প্রধান এবং স্থিতি-শীল এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রই একবাক্য। বৈদ্যশাস্ত্রের মতানুসারে—শ্লেষ্মা জলেরই প্রতিরূপ, পিত্ত অগ্নিরই প্রতিরূপ, আর বায়ু তো বায়ু আছেই। জল বায়ু এবং অগ্নি এই তিন ভূতের মধ্যে প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে—বায়ু, তাহার পরে অগ্নি, তাহার পরে জল; সুতরাং তিনের মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ, অগ্নি মধ্যম পদবিস্থ, এবং জল নিম্ন-পদবীস্থ। এখন বক্তব্য এই যে নিম্নতম পদবীস্থ জল বা শ্লেষ্মা যখন শাস্ত্রে তমোগুণ-প্রধান বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যম-পদবীস্থ পিত্তকে রজোগুণ-প্রধান বলিতেছি এবং উচ্চতম পদবীস্থ বায়ুকে সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিতেছি, ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে তবে সে দোষ—আমার তত নয়, যত শাস্ত্রের! যেহেতু শাস্ত্রে আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা!"

উপরে যাহা বলা হইল—সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বায়ু স্ফূর্ত্তি-শীল, এবং সত্ত্বগুণ-প্রধান; পিত্ত গতিশীল এবং রজোগুণ-প্রধান; শ্লেষ্মা স্থিতিশীল এবং তমোগুণ-প্রধান।

আপনারা আমাকে বলিতে পারেন যে, রোগ-চিকিৎসার কথা হইতেছে

তাহাই. হউক্—সত্ত্বরজস্তমো লইয়া এত মারামারি লাঠালাঠি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মৃদঙ্গের সুর-বাঁধা উপলক্ষে তাহার প্রত্যেক গাঁটে যখন মারামারি লাঠালাঠি হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপনারা একটি কথাও তো মুখে উচ্চারণ করেন না—অথচ তাহার উপদ্রবে আপনাদের কর্ণে তালা ধরিয়া যায়! ইহার বেলায় আপনারা যেমন ভবিষ্যতের অনুরোধে বর্ত্তমানের সাত খুন মাপ করেন, আমার প্রতিও আপনারা সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়; কেননা ইহার পরে যাহাতে বেসুরা ধ্বনির জ্বালায় আপনাদের কাণ ঝালাফালা না হয়, সেই উদ্দেশেই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বহুযত্নে আমার এই ভাঙা বীণা-যন্ত্রটীর পাঁচটা তারের পাঁচ রকম সুর একত্রে মিলাইয়া সকলকেই ঠিক্‌মাত্রায় বাগাইয়া আনিলাম। এক্ষণে আপনারা দেখিবেন যে, তারগুলি যদি পৃথক পৃথক ধ্বনিত করা হয় তবে পাঁচটি তার হইতে পাঁচটি বিভিন্ন সুর পরে পরে বিনির্গত হইবে; আর, সকল-গুলি যদি এক সঙ্গে ধ্বনিত করা হয়, তবে সকলের মধ্য হইতে একই সুমধুর তান ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া জাগরণের নবোদ্যম হইতে স্বপ্ন-মাধুর্য্যে এবং স্বপ্ন-মাধুর্য্য হইতে প্রসুপ্তির সুকোমল শয্যায় ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।

বীণার প্রথম তার—গুণ-ত্রয়; কি? না সত্ত্বরজস্তমো। দ্বিতীয় তার—দোষ-ত্রয়; কি? না বাত পিত্ত কফ। তৃতীয় তার—বৃত্তি-ত্রয়; কি? না চিন্তা চেষ্টা নিদ্রা। চতুর্থ তার—ভূতত্রয়; কি? না বায়ু অগ্নি জল। পঞ্চম তার—সমাজের দলত্রয়; কি? না সৃষ্টির দল, গতির দল স্থিতির দল।

প্রবন্ধের গোড়া বাঁধা শেষ হইল, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্—সমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

রোগ কি ? না ধাতু-বৈষম্য। ধাতুশব্দে সপ্ত ধাতুও বুঝায় ত্রিধাতুও বুঝায়। সপ্ত-ধাতু কি? না রস রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি শুক্র। ত্রিধাতু কি ? না ত্রিদোষ—বাত পিত্ত কফ ; তাহার সাক্ষী—শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে "কুণপে ত্রিধাতুকে"। বাত পিত্ত কফ কি অর্থে ত্রিদোষ এবং কি অর্থে ত্রিগুণ তাহা বৈদ্য-শাস্ত্রে সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা,—

"ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দুষ্যন্ত্যেভির্যতস্ততঃ বাত পিত্ত কফা এতে ত্রয়ো দোষা ইতি স্মৃতাঃ। তে ধাতবোঽপি বিদ্বদ্‌ভি র্গদিতা দেহ ধারণাৎ।"

অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ—সপ্ত ধাতু এবং মল-সমূহকে দুষিত করে—এই অর্থে দোষ ; আর, দেহের ধারণকর্ত্তা—এই অর্থে ধাতু। এখন বক্তব্য এই যে, ধাতুত্রয়ের উদ্যম-স্ফূর্ত্তির একটি মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে—তাহাই তাহাদের সাম্যাবস্থা এবং তাহাই শরীরের স্বাস্থ্য ; সেই সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে ওঠাও যেমন, আর সেই সাম্যের মাত্রা হইতে নীচে নাবিয়া পড়াও তেমনি, দুইই ধাতুবৈষম্য ; আর, সেই ধাতু-বৈষম্যের নামই রোগ বা ব্যাধি।

ধাতুত্রয়ের উদ্যম-স্ফূর্ত্তি যখন সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে উত্থান করে, তখনই তাহাদের নিজ-মূর্ত্তি গুলি প্রকাশ পাইয়া উঠে ; এইজন্য বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন গুণের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, তাহাদের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহারা কে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য ; তাহাই এক্ষণে করা যাইতেছে ;—

সৃষ্টির দলই সমাজের বায়ু ; এই দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে চিন্তা এবং কল্পনার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক বায়ু-বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ—উদ্‌ভ্রান্ত কবিত্বের অসম্বদ্ধ প্রলাপ ; দ্বিতীয় উপসর্গ—ন্যায়-শাস্ত্রীয় কুতর্ক-জালের ঢেঁকি'র কচকচি ; তৃতীয় উপসর্গ—বিজ্ঞান মহলে আনুমানিক সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি।

সমাজের পিত্ত কি ? না গতির দল ; এ এক-প্রকার গুণ্ডার দল ! এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে গাত্র-দাহ এবং ছট্‌ফটানি'র প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক পিত্তবৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ—উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিষ-দৃষ্টি ; দ্বিতীয় উপসর্গ রাষ্ট্র-বিপ্লব, দলাদলি, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, এবং স্থিতিভঙ্গ ; তৃতীয় উপসর্গ প্রবলের আধিপত্য ।

সমাজের শ্লেষ্মা কি ? না স্থিতির দল। এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে আলস্য অকর্ম্মণ্যতা এবং বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক শ্লেষ্মা-বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ বিলাসী রাজ-সভা এবং তাহার বাহ্য চাকচিক্য ; দ্বিতীয় উপসর্গ—জোঁকের ন্যায় রুধির-শোষক অমাত্যবর্গ এবং তাহাদের স্ফীত উদর ; তৃতীয় উপসর্গ—নিরন্ন প্রজাবর্গ এবং তাহাদের রুগ্ন দেহ।

ফরাসীস্ রাষ্ট্রবিপ্লব ত্রিদোষের প্রকোপাবস্থার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ফরাসীস্ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহা-দিগকে বলিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, Rousseau, Voltaire প্রভৃতি বায়ু-প্রধান মহাত্মারাই ফরাসীস্ বিপ্লবের সৃষ্টিকর্ত্তা কিনা মূল প্রবর্ত্তক ; আর, Robbespere, Danton প্রভৃতি পিত্তপ্রধান মহাত্মারা ফরাসীস্ বিপ্লবের গতিকর্ত্তা কিনা নির্ব্বাহ-কর্ত্তা। Rousseau Voltaire প্রভৃতি সৃষ্টি-শীল বায়ু-প্রধান ভট্টাচার্য্যেরাই Robbespere প্রভৃতি ভুঁইফোঁড় গতি-শীল ব্যক্তিদিগের পিত্তানল ফুঁ দিয়া উস্কাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা অনতি পরেই সে অনলের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ফরাসীস্ দেশের মস্তক-স্থানীয় ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মা (অর্থাৎ রাজ-পরিবার এবং আর আর স্থিতির দল) দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরেই সমস্ত ইউরোপময়—একদিকে পিত্তের প্রকোপ—নেপোলিয়ানের তোপাগ্নি ; আর একদিকে শ্লেষ্মার প্রকোপ—ইউরোপীয় রাজন্য সম্প্রদায়ের নাকের জল চোকের জল ; এবং মাঝখানে বায়ুর প্রকোপ—ইংলণ্ডের ভেদ-পটুতা ;

—এযে ভেদপটুতা—ইহা সামান্য ভেদপটুতা নহে! কীরূপ ভেদপটুতা যদি জিজ্ঞাসা করেন—তবে চুপি চুপি বলি শ্রবণ করুন্ :—বিরোধী পক্ষ-দ্বয়ের বিরোধানল ফুঁ দিয়া উস্কাইয়া তুলিয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়ানো এবং সুবিধামতে অগ্রসর হইয়া উপর-চাল চালা। এইরূপ বর্ত্তমান শতাব্দীর কৈশোর বয়সে ত্রিদোষের প্রকোপ-সূত্রে ইউরোপে সন্নিপাতের লক্ষণগুলি স্পষ্টাকারে দেখা দিয়াছিল; এমন কি—এখনো পর্য্যন্ত ইউরোপকে তাহার ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে।

এইরূপ, বাত-পিত্ত-কফের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের প্রতি স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিলে তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি এবং ভাব-গতি তাহার এক-একটি আদর্শ-লিপি হস্তে পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পরে সেই তিনটি আদর্শ-লিপির সহিত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেই, সমাজের কোন্ স্থানে কোন্ ধাতুর কিরূপ প্রভূর্ভাব, তাহা অনুসন্ধাতার চক্ষে সহজেই ধরা পড়িতে পারে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গ-সমাজের চতুঃসীমার অভ্যন্তরেই আমরা তিন দলের তিন রকম চাল্-চোল্ দেখিতে পাই; শ্লেষ্মার দলের চাল্-চোল্ বাঁধা-সাঁধা রকমের; পিত্তের দলের চাল্-চোল্ আঁকা-বাঁকা রকমের; বায়ুর দলের চাল্ চোল্ উড়ো-উড়ো রকমের!

শ্লেষ্মার দল কাঁহারা? না যাঁহারা নূতন উদ্যমকে ব্যাঘ্রের মতো ডরা'ন এবং গতানুগতিকতাকেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান পুরুষার্থ মনে করেন। ইঁহাদের আছে সকলই—বিদ্যা বুদ্ধি আছে, ভদ্রতা বিনয় আছে, বারো মাসে তেরো পার্ব্বন আছে;—সবই কিন্তু মুখস্থ রকমের! ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি মুখস্থ-রকমের, ভদ্রতা-বিনয় মুখস্থ-রকমের, এমন কি—দান ধ্যানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানও মুখস্থ-রকমের। মুখস্থ-রকমের—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে "mere conventional!" পুংলো বাজির কল যেমন

বাজিকরের হস্তে, ইঁহাদিগকে চালাইবার কল তেমনি অতীতের হস্তে। ইঁহাদের মতে অতীতের মতো কাল আর জগতে নাই; বর্ত্তমান অতিশয় কদর্য্য এবং জঘন্য; আর, ভবিষ্যৎ যার পর নাই অধম পাপিষ্ঠ; ভবিষ্যৎটা যদি আদবেই না থাকিত তো ভাল হইত! ধারাবাহিক লৌকিক প্রথা যাহা মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই ইঁহাদের একমাত্র আশ্রয়-দুর্গ! তাহার ঘুনধরা চৌকাটের এবং নোনা-ধরা প্রাচীরের এক পা বাহিরে পদার্পণ করিতে হইলেই ইঁহাদের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে।

শ্লেষ্মা স্থিতিশীল এবং ঠাণ্ডা, পিত্ত গতি-শীল এবং গরম! যাঁহারা স্থিতিশীলদিগের কুলপরম্পরাগত অযত্ন-সুলভ ভদ্রতা বিনয় মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া গাত্র-দাহে ছট্ ফট্ করিতে থাকেন, তাঁহারাই পিত্তের দল। ইঁহাদের প্রধান একটি গুণ এই যে, যত কেন ভাল সামগ্রী হউক্ না তাহার কু-টিই কেবল ইঁহাদের চক্ষে পড়ে, তাহার সু-য়ের প্রতি ইঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যদি এমন কোনো একটি বস্তু ইঁহাদের সম্মুখে দৈবযোগে উপস্থিত হয়, যাহার গুণ পোনেরো আনা —দোষ এক আনা, তবে, অন্যেরা যেথানে তাহার পোনেরো আনা গুণকে ষোলো আনা গুণ মনে করিবে, ইঁহারা সেইখানে তাহার এক আনা দোষকে যোল আনা দোষ মনে করিবেন! শ্লেষ্মার দল বলেন "পুরাণো চা'ল ভাতে বাড়ে," পিত্তের দল বলেন "পুরাণো চা'ল রোগীর পথ্য!" শ্লেষ্মার দল বলেন "যাহা আছে তাহাই থা'ক্, যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক্," পিত্তের দল বলেন "সমস্তই উল্টাইয়া যা'ক্—মাথা পায়ের নীচে যা'ক্, পা মাথা'র উপরে উঠুক্!" লোকালয়ে মড়ক উপস্থিত হইলে শকুনি বর্গের যেমন আনন্দ হয়, লোক-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে পৈত্তিক দলের তেমনি আহ্লাদ আর ধরে না!

শ্লেষ্মা স্থিতিশীল; পিত্ত গতিশীল; বায়ু সৃষ্টিশীল। বায়ুর দল পক্ষীর দল! বিগত শতাব্দীতে একদল গাঁজাখোর হরেক রকমের পাখী সাজিয়া ধনাঢ্য বাবুদিগের বৈঠকখানায় মজলিস্ জমাইত; ইহাদের নাম ছিল পক্ষীর দল। ইঁহারা মনোরাজ্যে বাস করেন, এবং কল্পনা লইয়া দিনাতপাত করেন! কখনো বা ইঁহারা স্থির-বায়ু হইয়া ভূলোক এবং দ্যুলোকের সন্ধি-স্থলে অবস্থিতি করেন; কখনো বা সেখান হইতে নীচে নামিয়া মুখের এক এক ফুঁয়ে পিত্তের অনল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়া এবং শ্লেষ্মার সাগরে তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দে'ন; কখনো বা মলয় মারুত বেশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সমাজের গ্রন্থি-সকল সরসও করেন—সতেজও করেন; এইরূপে রস এবং তেজের—শ্লেষ্মা এবং পিত্তের—বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সমাজের শ্রী ফিরাইয়া দে'ন। অতঃপর তিন ধাতুর মধ্যে বিরোধই বা কিরূপ, আর, বিরোধের ভঞ্জনই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তিন ধাতু যখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সমগ্র শরীরের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহারা গণনায় তিন হইলেও কার্য্যে এক। তিন ধাতুর মধ্যে যখনই এইরূপ একাত্ম-ভাব দেখিবে, তখনই জানিবে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্যমের মাত্রা ঠিক্ আছে; তাহার এক চুলও উপরে ওঠে নাই—একচুলও নীচে নাবে নাই। পক্ষান্তরে যখন দেখিবে যে, তিন ধাতুর উদ্দেশ্য তিন প্রকার—এ চায় ভাবের প্রাধান্য, ও চায় কাজের প্রাধান্য,সে চায় ভোগের প্রাধান্য; সকলেই স্ব স্ব প্রধান—সমগ্র শরীর কেহই নহে; যখন দেখিবে যে, শ্লেষ্মা শরীরকে ডুবাইয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, পিত্ত দগ্ধিয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, এবং বায়ু শুখাইয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই জানিবে যে, ধাতুর

অসংযত-উদ্যম-স্ফূর্ত্তি সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ত্রয়ের এইরূপ স্ব স্ব-প্রধান বিশৃঙ্খল ভাবই তাহাদের প্রকোপাবস্থা। প্রকোপই বিরোধের জন্মদাতা ;—ধাতুত্রয়ের প্রকোপ হইলেই তাহাদের মধ্যে বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

কোনো-একটি ধাতুর প্রকোপ হইলে, অপর দুইটি ধাতু তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এরূপ বিরোধ খুবই ভাল যদি তাহা সাম্য-মুখী হয়, অর্থাৎ যদি তাহার গতি সাম্যের দিকে হয়। পৃথিবী যদি চিরকালই সমুদ্র-রূপিণী শ্লেষ্মার গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া রসাতলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত ; তাহার উদরস্থিত আগ্নেয় পিত্ত যদি যথা-সময়ে উত্তেজিত না হইত ; সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া যদি পর্ব্বত-রাজি আকাশে মস্তক উত্তোলন না করিত ; তবে পৃথিবীর দশা আজ কি হইত ? এরূপ বিরোধের উদ্দেশ্য টক্‌রাটক্‌রিও নহে, আড়াআড়িও নহে, বৈরনির্য্যাতনও নহে ;—ইহার উদ্দেশ্য কেবল সাম্য-সংস্থাপন ; তাহার সাক্ষী—একদিকে যেমন পর্ব্বতরাজি সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া আকাশে মস্তক উত্তোলন করে, আর-একদিকে তেমনি পর্ব্বত হইতে নদনদী প্রসূত হইয়া পর্ব্বত এবং সমুদ্রের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ়-রূপে আঁটিয়া দেয় ; সমুদ্র পর্ব্বতকে তুষারের বাষ্পীয় উপাদান প্রণামি দেয়—পর্ব্বত সমুদ্রকে গৈরিকারক্ত জলরাশি আশীর্ব্বাদি প্রদান করে ; এইরূপে উভয়ের মধ্যে স্নেহ-ভক্তির আদান-প্রদান অহর্নিশি চলিতে থাকে। বিরোধের গতি যখন, এইরূপ, সাম্যের দিকে হয়, তখন বিরোধ হইতেই বিরোধের ভঞ্জন প্রসূত হইয়া বিরোধী পক্ষদয়ের মধ্যস্থলে পরম আরোগ্য এবং পরমাশান্তি আনিয়া উপস্থিত করে। এইরূপ সাম্যমুখী বিরোধ—যাহার কথা আমি এক্ষণে বলিতেছি, তাহা একটি নৈসর্গিক কাণ্ড! তাহা প্রকৃতি-মাতার স্বহস্তের চিকিৎসা-কার্য্য! তাঁহার হস্তের কার্য্যে তাঁহার প্রাণ রহিয়াছে—

সে কার্য্য তিনি যেমন পরিপাটী-রূপে নির্ব্বাহ করেন—অপর কাহারো তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে—স্বয়ং ধন্বন্তরীরও নহে। প্রকৃতি মাতার স্বহস্তের এই যে চিকিৎসাপ্রণালী, ইহা সকল চিকিৎসারই মূল আদর্শ! প্রকৃতি-মাতার নিকটে হাইড্রোপাথিও নূতন নহে—হোমিওপাথিও নূতন নহে। মেদিনী যখন প্রখর গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হয়, তখন তিনি তাহার মস্তকের উপরে হুড়হুড় করিয়া বর্ষার বারিধারা ঢালিয়া দে'ন—ইহার তুল্য হাইড্রোপাথি কে কোথায় দেখিয়াছে! আবার লোকালয়ে যখন দুষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন তিনি দুষ্টকে দিয়া দুষ্টের দমন করেন—ইহার তুল্য সূক্ষ্ম হোমিওপাথিই বা কে কোথায় দেখিয়াছে! প্রকৃতি-মাতার এই যে স্বহস্তের চিকিৎসা প্রণালী, ইহার নাম আমি কিয়ৎপূর্ব্বেই আপনাদের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি; কী? না সাম্যমুখী বিরোধ অর্থাৎ যে বিরোধের লক্ষ্য এবং গতি সাম্যের দিকে। আর এক প্রকার বিরোধ আছে—সেইটিই সর্ব্বনাশের মূল;—কী? না বৈষম্যমুখী বিরোধ। ইহার লক্ষ্য সাম্য সংস্থাপন নহে, কিন্তু ঠিক্ তাহার বিপরীত; ইহার লক্ষ্য আপনার আপনার প্রাধান্য-সংস্থাপন। সাম্য-মুখী বিরোধ যেমন বিরোধী পক্ষদ্বয়'কে বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত করিয়া দিবার সোপান, বৈষম্য-মুখী বিরোধ তেমনি বিরোধী পক্ষদ্বয়কে তীব্র হইতে তীব্রতর বৈষম্যে উপনীত করিয়া দিবার সোপান। সাম্যমুখী বিরোধ আরোগ্যের সোপান, বৈষম্য-মুখী বিরোধ বিনাশের সোপান! ইহার একটি শরীর-ঘটিত উদাহরণ দিতেছি;—শ্লেষ্মার প্রকোপ একপ্রকার ধাতু-বৈষম্য, পিত্তের প্রকোপ আর এক প্রকার ধাতু-বৈষম্য; একদিকে শ্লেষ্মার প্রকোপ হইলেই তাহার পাল্টা দিবার জন্য আর এক দিকে পিত্তের প্রকোপ হয়; এরূপ অবস্থায়—দুই পক্ষের বিরোধ যদি সাম্য-মুখী হয়, তবে উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েরই ক্রমে ক্রমে সাম্যের দিকে গতি হইতে থাকে; আজ

এ-বেলা-পিত্তের দাহ তাপ-মানযন্ত্রের পারদ-রেখা'কে ১০৩-এর দাগে উঠাইয়া দিল, ও-বেলা শ্লেষ্মার গুরুভার তাহাকে ৯৭-এর দাগে নাবাইয়া দিল; দ্বিতীয় দিন পিত্তের দাহ পারদরেখা'কে তত উচ্চে না উঠাইয়া ১০১-এর দাগে উঠাইল, এবং শ্লেষ্মার গুরুভার পারদরেখা'কে তত নীচে না নাবাইয়া ৯৭৷৷০ এর দাগে নাবাইল; তৃতীয় দিন পারদ-রেখা ৯৮ এর দাগে উঠিয়া সেইখানেই স্থির রহিল। ইহারই নাম শ্লেষ্মার এবং পিত্তের (অথবা যাহা একই কথা—নরম এবং গরমের) সাম্যমুখী বিরোধ; আর, এইরূপ সাম্য-মুখী বিরোধই আরোগ্যের মূল। ইহার পরিবর্ত্তে যদি বিরোধের গতি হয় দুই পক্ষেরই উত্তরোত্তর অধিকাধিক প্রকোপের দিকে; যদি এরূপ হয় যে, প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিনে গাত্র উষ্ণ হইবার সময়েও বেশী উষ্ণ—শীতল হইবার সময়েও বেশী শীতল; তৃতীয় দিনে আবার ততোধিক; এইরূপ করিয়া বিরোধ যদি বিরোধী পক্ষদ্বয়কে উত্তরোত্তর ক্রমশই বৈষম্য হইতে বৈষম্যের দিকে লইয়া যাইতে থাকে; তবে-আর কিছুতেই রক্ষা নাই! দুর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গসমাজে শেষোক্ত প্রকার বিপত্তি-ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ কতক কতক দেখা দিয়াছে। তাহার সাক্ষী—শ্লেষ্মার গলা ঘড়্-ঘড়ানি নিষ্কর্ম্মা বিলাসীদিগের সকাল বিকাল সন্ধ্যা আল্‌বো'লা গুড়গুড়ির ঘড়্‌ঘড়ানি-সহকৃত গাল-গল্পে পরিণত হইতেছে; পিত্তের গাত্রদাহ উকিল মোক্তার দালাল প্রভৃতির নানা-প্রকার পাকচক্রময় ফন্দি বাজিতে এবং কলিকাতার জনতারণ্যে দিশাহারা নিঃসহায় নিরুপায় ক্ষীণজীবি B. A. M. A. দিগের বিফল দন্ত আস্ফালনে পরিণত হইতেছে; আর, বায়ুর হাত-পা খিঁচুনি পত্র-সম্পাদকের লেখনীর আঁচড়া-আঁচড়ি ঠোক্‌রা-ঠুক্‌রি এবং খোঁচা-খুঁচিতে পরিণত হইতেছে। তিন ধাতুর এইরূপ প্রকোপের অবস্থা—গতিক বড় ভাল নহে; ইহা সন্নিপাতেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। এরূপ অবস্থার বাড়াবাড়ি হইলে শ্লেষ্মার প্রতিবিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—

রোগীকে বিষ-বড়ি খাওয়ানো কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে তিন-ধাতুর প্রকোপ এখনো ততদূর চরম অবস্থায় পৌঁছে নাই; তাই বলি যে, এত শীঘ্র বিষ-বড়ি খাওয়াইয়া বঙ্গসমাজের রক্ত গরম করিয়া তুলিয়া তাহাকে হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার—এরূপ একটা সঙ্কট-স্থানে অবস্থাপিত করা কোনো সুচিকিৎসকেরই পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে না। বঙ্গ-সমাজে ত্রিদোষ এখনো এতদূর দিক্‌বিদিক্‌-শূন্য হয় নাই যে, তাহাকে কৌশলে সাম্যের পথে ধীরে ধীরে বাগাইয়া আনা যাইতে না পারে। সুচিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই বেলা ভালো'য় ভালো'য় তিন ধাতুর মধ্যে একাত্মভাব সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। তিন ধাতু যাহাতে আপনার আপনার প্রাধান্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমগ্র সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য;—কেননা এখনও সময় আছে; সময় হাত ছাড়া হইয়া গেলে মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করিলেও কিছুতেই কিছু হইবে না!

সামাজিক রোগের চিকিৎসা দুইরূপ—আসুরিক চিকিৎসা এবং সুচিকিৎসা।

আসুরিক চিকিৎসা কী? না বিরোধী ধাতু-ত্রয়ের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার মূলোচ্ছেদ করা। সুচিকিৎসা কী? না বিরোধী পক্ষত্রয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা। আসুরিক চিকিৎসা খুব সহজ; তাহা আর কিছু না—যদি বায়ুর প্রকোপ বশতঃ সমাজের মস্তিষ্কে কোনো প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে তবে তলোয়ারের এক কোপে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফ্যালো; তাহা হইলেই তাহার সমস্ত আধিব্যথা একেবারেই নির্ব্ব্যথা হইবে; যদি পিত্তের প্রকোপ বশতঃ সমাজের গতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, তবে গদাঘাতে তাহার হাত পা খোঁড়া করিয়া দেও, তাহা হইলেই তাহার গতিশীলতা জন্মের মত প্রশান্ত হইয়া

যাইবে; যদি বুকে শ্লেষ্মা আটকাইয়া সমাজ শয্যাগত হইয়া থাকে, তবে বুকে শেল বিঁধাইয়া দেও, তাহা হইলেই শ্লেষ্মা পালাইতে পথ পাইবে না! আসুরিক চিকিৎসা একে তো এই, তাহাতে আবার যদি চিকিৎসক-টি হাতুড়ে শ্রেণীভুক্ত হ'ন, তবে-আর রক্ষা নাই! অতএব তাহাতে কাজ নাই—বৈদ্য-শাস্ত্রের মতানুযায়ী সুচিকিৎসার পন্থা অন্বেষণ করা যাক। সুচিকিৎসা অপেক্ষাকৃত কঠিন; তাহা এই যে, ধাতুত্রয়ের মধ্যে কোনো একটির যদি সমধিক প্রকোপ হইয়া থাকে, তবে অপর দুইটির সহিত তাহার সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে সাম্যাবস্থায় বাগাইয়া আনা। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে শেষোক্ত চিকিৎসা-প্রণালীই বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান ধাতবিক অবস্থার সবিশেষ উপযোগী; সে ধাতবিক অবস্থা কিরূপ তাহা যদি আপনারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে ধৈর্য্য-যষ্টি অবলম্বন করিয়া আমার সঙ্গে আসুন্—আমি আপনাদিগকে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই খুলিয়া-খালিয়া দেখাইতেছি।

এক্ষণে বঙ্গ-সমাজে, তিন ধাতু তিন বিরোধী পক্ষে পরিণত হইয়াছে; —কী? না এ পক্ষ, ওপক্ষ এবং অনুভয় পক্ষ; "অনুভয় পক্ষ" অর্থাৎ না এপক্ষ, না ওপক্ষ। শ্লেষ্মা'র দল এপক্ষ; পিত্তের দল ওপক্ষ; আর, বায়ুর দল অনুভয় পক্ষ। অনুভয় পক্ষ কখনো বা এ পক্ষের হইয়া ও পক্ষের সহিত বিবাদ করেন; কখনো বা ও-পক্ষের হইয়া এ-পক্ষের সহিত বিবাদ করেন; যেহেতু বায়ুর বিচিত্র গতি! বায়ু কখনো বা পূর্ব্ব-মুখো হয়, কখনো বা পশ্চিম-মুখো হয়; তাহাকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে ধরিয়া রাখা দেবতারও অসাধ্য!

•

বৈদ্য-শাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যের শৈশবাবস্থা শ্লেষ্মা-প্রধান। কচিবয়সে লোকে পিতা-মাতার নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, তাহারা প্রথমে সেই পক্ষ অবলম্বন করে, ইহাকেই আমি বলি—এ পক্ষ।

তাহার পরে কতক বা বুদ্ধির গতিকে, কতক বা কাজের গতিকে, কতক বা ভাবের গতিকে, কতক বা সঙ্গের গতিকে, লোকে যখন পক্ষান্তর অবলম্বন করে, তখন তাহাকেই আমি বলি—ও পক্ষ। তাহার পরে যখন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা দুই পক্ষ হইতেই ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ভাল মন্দ বিচার করে; সাদা কথায়—একবারকার রোগী যখন আরবার কার রোজা হয়; তখন তাহাকেই আমি বলি—অনুভয় পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন কেবল শূন্যে ভর করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাকেই আমি বলি—উদাসীন পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন (জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্) উভয় পক্ষের বিরোধানলে আহুতি প্রদান করে তখন তাহাকেই আমি বলি—বিভেদী পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন উভয়-পক্ষের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকেই আমি বলি—মধ্যস্থ পক্ষ। যদি আপনারা তিন পক্ষ চা'ন তাহাও আছে, আর, যদি পাঁচ পক্ষ চা'ন তাহাও আছে; তিন পক্ষ কী? না এ পক্ষ, ও পক্ষ, অনুভয় পক্ষ; পাঁচ পক্ষ কী? না এপক্ষ, ওপক্ষ, উদাসীন পক্ষ, বিভেদী পক্ষ, মধ্যস্থ পক্ষ। এই সব পক্ষাপক্ষি এবং দলাদলির গোড়া'র কাহিনীটি এইখানে আমি আপনাদের নিকটে ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি, তাহা এই,—

আমাদের দেশে প্রথম প্রথম অর্থোপার্জ্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রবর্ত্তক ছিল। ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর যে, কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজেরিও নামক একজন উঁচু দরের বায়ু-প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহারই মুখের

ফুঁয়ে ছাত্রদিগের পিত্তানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই অঙ্কুর যখন কাল-ক্রমে সতেজ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় "ইয়ঙ্ বেঙ্গালের দল" এবং বাঙ্গালি ভাষায় "ছোঁড়ার দল" উপাধি প্রাপ্ত হইল। অন্যকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাধির ভার স্কন্ধে বহিতে হয়—এই গতিকে উপাধি-প্রদাতারাও একটি পাল্টা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন;—কী? না গোঁড়া'র দল। বঙ্গ সমাজে, এইরূপে, দুই পক্ষের সৃষ্টি হইল—গোঁড়া'র দল এবং ছোঁড়ার দল; গোঁড়া'র দল এ-পক্ষ, এবং ছোঁড়া'র দল ও-পক্ষ। এই দুই পক্ষ তাড়িত-পদার্থের দুই বিপরীত পক্ষের সহিত উপমেয়। তাড়িত-পদার্থের আধার-বস্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—রোধক এবং সঞ্চারক। রোধক কী? না যাহা তাড়িত-পদার্থের গতিরোধ করে; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে Non-conductor। এখানে রোধক পদার্থ কে? না ইংরাজ-শাসন। ইহার নিকটে দুই পক্ষের কোন পক্ষেরই জারি-জুরি খাটে না। রোধক-পদার্থটি—চক্ষে দেখা যায় না এইরূপ পাৎলা একখানি কাচ-ফলক—কিন্তু তাহা বজ্র অপেক্ষাও সু-কঠিন। সঞ্চারক পদার্থ কি? না যাহা তাড়িত-পদার্থকে আপনার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পথ ছাড়িয়া দেয়; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে conductor। এখানে সঞ্চারক পদার্থ কে? না আমাদের স্বজাতি—বাঙ্গালি। এখন, কাণ্ডখানা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা এই;—মাঝখানটিতে রহিয়াছে একখানি অদৃশ্য অথচ বজ্র-কঠিন পাৎলা কাচ—ইংরাজের শাসন, আর সেই কাচের দুই পৃষ্ঠে দুইখানি নরম তাঁবা'র পাত—এমনি নরম যে, দুইটির যাহাকে যে দিকে নোয়াও তাহা সেই দিকে নোয়; অর্থাৎ দুই দল বাঙ্গালি। তাহার মধ্যে একটি তাঁবার পাত ভারত ভূমির তাম্র-খনির সঙ্গে তার-যোগে সংযুক্ত, আরেকটি তাঁবার পাত তাড়িত-যন্ত্রের সহিত (অর্থাৎ

নব-প্রতিষ্ঠিত কালেজের সহিত) তার-যোগে সংযুক্ত। এইরূপ পরিপাটী-রকমে কল পাতা হইলে পর, অনতিপরেই তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল ; ব্যাপারটি যাহা ঘটিল—তাহা এই ;—কাচ-ফলকের ও পৃষ্ঠের তাঁবার পাতে ওপক্ষীয় তাড়িত পদার্থ এক এক দমকে এক এক ক্ষেপ করিয়া কালেজ হইতে যেমন যেমন উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার পাল্টা দিবার জন্য কাচ-ফলকের এপৃষ্ঠে এ পক্ষীয় তাড়িত পদার্থ তেমনি তেমনি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। রাজধানীতে যেই কালেজ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সেই-অমনি চতুষ্পাঠীবৃন্দ তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল। ও পক্ষে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের এক এক অভিমন্যু, এ পক্ষে গোঁড়া'র দলের সাত সাত মহারথী—দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। গোঁড়াদিগের পক্ষ হইতে অভিসম্পাত এবং ধোপা-নাপিত-বন্ধের ব্যবস্থা, আর, ইয়ঙ্ বেঙ্গালের পক্ষ হইতে প্রণতের প্রতি স্বর্ণ রজতের সুদর্শন চক্র—অপরের প্রতি অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ, এইরূপ দুই পক্ষ হইতে দুইরূপ বাণ-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু "স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের একঘা!" ইংরাজি বিদ্যার প্রখর আলোকে এবং প্রচণ্ড উত্তাপে গোঁড়ামি ক্রমশই সহর নগর হইতে দূর-দূরস্থিত পল্লিগ্রামে নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল :—আলোক ইস্কুল-মাষ্টারদিগের মধ্য হইতে এবং উত্তাপ দারোগা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের মধ্য হইতে চারিদিকে ছট্‌কিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের বিষ দাঁত গজাইয়া উঠিল এবং গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে এক প্রস্থ জয়-পরাজয় হইয়া চুকিয়া বঙ্গ-সমাজ কিছুকালের মতো নির্বিবাদে শান্তি সম্ভোগ করিতে লাগিল। এই সময়কার থমথোমে অবস্থায় আমাদের দেশে সর্ব্ব-প্রথমে সোমপ্রকাশ এবং তাহার গণ্ডা গণ্ডা অনুপ্রকাশ কালোচিত সভ্য-ভব্য বেশে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশে সাঁচা সংবাদপত্রের

এই নূতন গোড়াপত্তন। ইহার অনতি-পরে বঙ্গ-দর্শনের জ্যোৎস্না-বিকাশ পূর্ণিমা-শিখরে আরোহন করিয়া শুক্লপক্ষ হইতে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপক্ষে ঢলিয়া পড়িতে চলিল, আর, তাহার পিছনে পিছনে—দল কে দল সাহিত্য-সমালোচক মাসিক-পত্রিকা মুদ্রা যন্ত্র হইতে ঘন ঘন প্রসূত হইতে লাগিল। সেই সব নানা রঙের নানা ঢঙের নানা পত্রিকায় নানা বিরোধী পক্ষের ঢুসা-ঢুসি-গতিকে, এবং তাহা ছাড়া, নানা দেশের নানা সম্প্রাদায়ের নানা শাস্ত্রের নানা প্রকার বিরোধী মতের আন্দোলন গতিকে, আমাদের দেশে অনুভয় পক্ষের সৃষ্টি হইল। অনুভয় পক্ষের গোড়া'র বৃত্তান্তটি আপনা-দিগকে তবে আমি বলি—যেহেতু রোগ যত শীঘ্র হয় বাহির করিয়া ফেলাই ভাল, তাহাকে চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে; তাহা এই;—

পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই—পৃথিবী ক্রমাগতই ঘুরিতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের জীবন-চক্রও ঘুরিতেছে; বাল্য যৌবন এবং জরা জন-সমাজে উল্টিয়া-পাল্টিয়া ক্রমাগতই আসিতেছে যাইতেছে। লোকের মতিও সেই অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইংলণ্ড-দেশীয় সুবিখ্যাত কবিবর সেলি যদিচ প্রত্যুষেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মানব-জীবনের পরিণত অবস্থার একটি নিগূঢ় রহস্য (কি জানি কেমন করিয়া) বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বলেন যে, জীবনের প্রথমার্দ্ধে আমরা যাহা শিক্ষা করি—জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ কাটিয়া যায় মন হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে। ঘটিকা যন্ত্রের দোলকের ন্যায় পৃথিবী যেমন গ্রীষ্ম হইতে শীতে এবং শীত হইতে গ্রীষ্মে দোলায়মান হইতেছে, সমাজের লোকও তেমনি এ-পক্ষ হইতে ও-পক্ষে এবং ও-পক্ষ হইতে এ-পক্ষে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে। আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতারা অনেক কাল ধরিয়া শাস্ত্রীয় শাসনের পেষণ-যন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া-আসিয়া হঠাৎ যখন একদিন দেখিতে পাইলেন যে, সে সমস্তই মিথ্যা

বিভীষিকা, তখন তাঁহারা গর্জ্জন-কারী কোটালের বাণের ন্যায় হুহুঃশব্দে এপক্ষ হইতে ওপক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন; তাহার কিয়ৎ-কাল পরে শাস্ত্রীয় পেষণ-যন্ত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যখন রাক্ষসী-মায়ার রুধির-শোষক বশীকরণ-মন্ত্রে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা সভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ওপক্ষ হইতে এ-পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রীক দেশীয় বিষ্ণুশর্ম্মা ঈসফের হিতোপদেশে এইরূপ একটি উপন্যাস লিখিত আছে যে, একদা একদল ভেক যুটিয়া একটা কাষ্ঠখণ্ডকে আপনাদের রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিল; ক্রমে যখন তাহাদের জ্ঞান জন্মিল যে, এ রাজা কোনো কর্ম্মের নয়; তখন তাহারা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটা সারস-পক্ষীকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। সারস-পক্ষী এমনি অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত টপাটপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দুই দিনেই ভেক-বেচারীদিগের গাঁ উজাড় হইয়া গেল। এখন বক্তব্য এই যে, দিশী শাস্ত্র এখানে কাষ্ঠ-খণ্ড, বিলাতী শাস্ত্র সারস-পক্ষী; আর মণ্ডুক-দল আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালি ভায়ারা। বঙ্গ সমাজে এক্ষণে একটি অতীব কৌতুকাবহ নাট্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইতেছে, তাহা এই;—এ দিকে ভুক্তভোগী বৃদ্ধ ব্যাঙের দল সারসপক্ষীর আড়-দৃষ্টির সম্মুখ হইতে কায়ক্লেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার [illegible] জরাজীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন; ওদিকে আপাতদর্শী নবীন ব্যাঙাচির দল সারস পক্ষীর কৃপা কটাক্ষের ভিখারী হইয়া সারসীয় ঢঙের পক্ষ-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। এই সূত্রে দুই পক্ষের মধ্যে এক্ষণে খুবই আড়াআড়ি চলিতেছে। এ-ছার আড়াআড়ি'র কারণ কী? কারণ কী! কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে! আড়াআড়ি'র কারণ বাড়াবাড়ি! কাষ্ঠাশ্রিত বৃদ্ধ ভেকের দলের ঘুনন্ত স্ফীত-ভাবের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ সে কালের

দোহাই দিয়া "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" গতিকের অকর্ম্মণ্যতা, আর, সারসাশ্রিত ব্যাঙাচির দলের বেয়াল্লিস-কর্ম্মতা, অর্থাৎ সারসের মুখোস মুখে দিয়া স্বজাতীয় ভেক-মণ্ডলীর সম্মুখে খটস্ খটস্ করিয়া বেড়াইয়া পৃথিবীকে নির্ভেক করিবার চেষ্টা; দুই দলের এই রূপ দুই প্রকার অসঙ্গত বাড়াবাড়ি হইতে দোঁহার মধ্যে মর্ম্মান্তিক আড়াআড়ি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। কাষ্ঠাশ্রিত ব্যাঙের দল মহা আড়ম্বরের সহিত শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া এ কালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন; সারসাশ্রিত ভেকের দল ততোধিক আড়ম্বরের সহিত রণ-বাদ্য বাজাইয়া এ দেশের স্কন্ধে ও-দেশের বোঝা চাপাইতে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না! কেন এ বৃথা পণ্ডশ্রম! কেনই বা একালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপানো, আর, কেনই বা এ দেশের স্কন্ধে ও-দেশের বোঝা চাপানো! এ কালের স্কন্ধে এ কালের বোঝা যথেষ্ট আছে—এ দেশের স্কন্ধে এ দেশের বোঝা যথেষ্ট আছে—তাহা সে আগে সাম্‌লা'ক্; তাহার পরে না হয় তুমি সে কালের, অথবা ও-দেশের, দুটা উপরি বোঝা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলে—সে তো খুব ভাল কথা! কিন্তু তাহা তুমি করিবে না! তুমি চাও এ কালকে গলা টিপিয়া বধ করিতে —উনি চা'ন এ-দেশকে গলা টিপিয়া যমালয়ে পাঠাইতে! যাহা হইতেও পারে না, আর, যাহা, হইলেও তাহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই, এইরূপ একটা অলীক আড়ম্বরের পদতলে তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম সমস্তই তোমরা মাটি করিতেছ! বুঝিয়াছি তোমাদের মনের ভাব—তাহা এই যে, নিশান উড়াইয়া জগঝম্প বাজাইয়া একটা অভূক্ত-পূর্ব্ব সঙ্ তো পথের মাঝখানে খাড়া করি—রাস্তার দুই ধারে লক্ষ লোকের দুই-লক্ষ চক্ষু তো আমার উপরে ঝাঁকিয়া পড়ুক, সেই সঙ্গে দুই লক্ষ আরো কোনো সামগ্রী পড়িলে আরো ভাল হয়—তাহার পরে তাহার ভাল মন্দ ফলাফল ধীরে সুস্থে

বিচার করিতে বসা যাইবে ; সে—পরের কথা ! এখন তাহার জন্য বেশী কি এত মাথা-ব্যথা !" এ যাহা বলিলাম—এটা দুই পক্ষের মন্দের দিক্ ; তা ছাড়া দোঁহার ভালো'র দিক্‌ও আছে। কিন্তু ভালো'র দিক্‌টা স্বাস্থ্যেরই অঙ্গ—রোগের অঙ্গ নহে। এখানে এখন কেবল রোগের কথা হইতেছে—স্বাস্থ্যের কথা হইতেছে না। পরে যখন রোগের চিকিৎসা উপলক্ষে আরোগ্যের উপায় নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে তখন দুয়ের ভালো'র দিক্ বিচার স্থলে আসিবে ; এখন কেবল উভয়ের দোষাংশের প্রতিই—রোগের প্রতিই—লক্ষ্য নিবদ্ধ করা পরামর্শ-সিদ্ধ। ইংরাজি ভাষায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে আর, বোধ করি, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন—তাহা এই যে, রোগ জানিতে পারা অর্দ্ধেক আরোগ্য To know the disease is half the cure ; এ যখন আপনারা জানেন, তখন রোগীর ক্ষতস্থানে এষণী [অর্থাৎ probe] চালনা করিতে যে, চিকিৎসকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহা আপনারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখন কোম্পানির আমলের এপক্ষ এবং ওপক্ষের সহিত এক্ষণকার এই মহারাণীর আমলের এ পক্ষ এবং ও পক্ষ মিলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্ত্তমান আমলের দুই পক্ষের কোনো পক্ষই—না এ-পক্ষ—না ও-পক্ষ। বর্ত্তমানকালের উভয় পক্ষই অনুভয় পক্ষ—তবে কিনা ছদ্মবেশী অনুভয় পক্ষ। কোম্পানির আমলে দুই পক্ষের মধ্যে যত কিছু দলাদলি এবং আড়া-আড়ি চলিত সমস্তই মত ও বিশ্বাস লইয়া। ইয়ঙ্-বেঙ্গালের দল গোঁড়ার দলকে সত্যসত্যই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, গোঁড়া'র দলও তেমনি বিপক্ষ দলকে সত্যসত্যই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের কাহারো অন্তঃকরণে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। তখনকার ইয়ঙ্-বেঙ্গালের দল সহস্র আচার ভ্রষ্ট হইলেও ও-দেশী সঙ্ সাজিতেন না ; আর তখনকার কালের

অতি বড় গোঁড়া হিন্দুও সে-কালের একটা স্বকপোলকল্পিত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তাহার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেন না। তখনকার সাঁচা হিন্দুরা কাল ভাঁড়াইতেন না—একালের হইয়া সেকালের ভান করিতেন না; আর, তখনকার সাঁচা কৃতবিদ্য সম্প্রদায় দেশ ভাঁড়াইতেন না—এদেশের হইয়া ওদেশের ভান করিতেন না; তাহার সাক্ষী, ওপক্ষের—খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ, পাদ্রি কৃষ্ণবন্দ এবং তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত আর আর সম্ভ্রান্ত মহোদয়বর্গ; এপক্ষের—রাজা রাধাকান্ত দেব, এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপদবীস্থ শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি মহোদয়বর্গ। রামগোপাল ঘোষ ইয়ং-বেঙ্গালদিগের সর্দ্দার ছিলেন বলিলেই হয়, অথচ তিনি আচারে ব্যবহারে লোক-লৌকিকতায় এদেশী যতদুর হইতে হয় তাহাই ছিলেন; তবে, শাস্ত্রের শাসন তিনি আদবেই গ্রাহ্য করিতেন না। তখনকার ইয়ং-বেঙ্গালেরা যখন শাস্ত্রীয়-শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেন তখন মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, "আমরা জ্ঞানের ফৌজ হইয়া অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি!" তেমনি আবার গোঁড়া হিন্দুরা যখন ইয়ংবেঙ্গালের বিপক্ষে ঘোঁট করিতেন তখন তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে,"আমরা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া অধর্ম্ম দমন করিতেছি!" তখনকার ইয়ংবেঙ্গালেরা ওদেশের তত পক্ষপাতী ছিলেন না যত ওদেশীয় বিজ্ঞানের এবং ওদেশীয় কর্ম্মনৈপুণ্যের; তথৈব, তখনকার গোঁড়া হিন্দুরা সেকালের তত পক্ষপাতী ছিলেন না যত সে-কালের শাস্ত্রানুযায়ী আচার-ব্যবহারের। কিন্তু এখন যাঁহারা একবারকার রোগী আরবারকার রোঝা—জোয়ারের সময়ে যাঁহারা ইয়ংবেঙ্গাল ছিলেন এবং ভাঁটার সময়ে যাঁহারা সুড়সুড় করিয়া গোঁড়ার দলে ঢুকিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনকে সহস্র গড়িয়া-পিটিয়া গোঁড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের মন কিছুতেই বাগ মানিবে না; কেননা, যেমন চক্ষু বুজিয়া কাণা হওয়া অসম্ভব,তেমনি গোঁড়া হইব মনে করিয়া গোঁড়া

হওয়া অসম্ভব। তেমনি আবার যাঁহারা ওদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ওদেশীয়দিগের দলে মিশিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরও সে চেষ্টা বৃথা-চেষ্টা ; কেননা, যেমন বরফে গড়াগড়ি দিয়া গৌরাঙ্গ হওয়া অসম্ভব, তেমনি ওদেশের বুলি মুখস্থ করিয়া ওদেশী হওয়া অসম্ভব।

বৈদ্য-শাস্ত্রে বলে যে, বৃদ্ধ বয়স বায়ু-প্রধান। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, চিন্তার সঙ্গে বায়ুর হরিহরাত্মা সম্বন্ধ ; প্রসিদ্ধও আছে যে,"বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ"; এরূপ যখন—তখন বৃদ্ধ ব্যাঙের দল যে, সমূলে চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া সত্য-সত্যই কাঁচিয়া গোঁড়া'র দলে মিশিবেন—এ তো কোনো শাস্ত্রেই বলে না! আমার তাই বিশ্বাস যে, ভাঁটার সময়ে যখন গতি-শীলেরা স্থিতিশীল-দিগের শরণাপন্ন হ'ন, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে যদিচ শ্লেষ্মা-প্রধান এপক্ষ, কিন্তু তলে তলে তাঁহারা বায়ু-প্রধান অনুভয়পক্ষ। গোঁড়া'র আর কোনো গুণ তাঁহাদের থাক্ বা না থাক্, তাহার প্রথম অক্ষরটি তাঁহাদের খুবই আছে—গোঁড়ামির গোঁ-টি তাঁহাদের খুবই আছে। কিন্তু বলিতে কি—জাত গোঁড়াদের গণ্ডির ভিতরে তাঁহাদের সে গোঁ'য়ের কোনো জারিজুরিই খাটে না—সেখানে তাঁহারা কোনো গতিকে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গোঁ একেবারেই ধোঁ হইয়া গিয়া তাঁহারা নিতান্তই ধোঁড়া বনিয়া যা'ন। ভিতরে ভিতরে ইহাঁরা বায়ু তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই ; তবে কি না—ইহাঁরা জো'লো বায়ু ; গ্রীষ্মের দমনার্থে (অর্থাৎ পিত্তপ্রধান গতিশীলদিগের দমনার্থে) ইহাঁরা শ্লেষ্মার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন! যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু তাঁহারা সত্যসত্যই গোঁড়া হিন্দু ; কিন্তু ইহাঁরা তাহার দিক্‌দিয়াও যা'ন না ; ইহাঁদিগকে গোঁড়া হিন্দু বলিলে ইহাঁদেরও মান-লাঘব করা হয়, আর, গোঁড়া হিন্দুদিগেরও মান লাঘব করা হয় ;—অনেক-কাল হইতে ইহাঁদের হিঁদুয়ানির বিষ-দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে, এই জন্য ইহাঁদিগকে আমি বলি "ধোঁড়া হিন্দু"। ধোঁড়া হিন্দু, সারস-টা'র সহিত ইতিপূর্ব্বে যেরূপ মাথামাথিভাবের সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন,

এক্ষণে তাহা একেবারেই গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চা'ন ; কিন্তু হইলে হইবে কি—কম্‌লি ছোড়্‌তা নেই ! ভালুককে তিনি ছাড়িতে চা'ন কিন্তু ভালুক তাঁহাকে ছাড়ে না ! ধোঁড়া হিন্দু তো এই—ধোঁড়া সাহেব আবার তাঁহা অপেক্ষা আর-এক-কাটি সরেস ! ধোঁড়া-সাহেব জাত-সাহেবের ধামা ধরিয়া চলেন, এবং স্বজাতীয় বৃদ্ধ ভেক দেখিলে ফণা ধরিয়া ওঠেন ; কিন্তু সে ফণার ভিতরে বিষ কোথায় ? ধামা ধরা'র সঙ্গে ফণা ধরা'র মিল খায় কই ? বাহিরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া ঘরে বড়-মানুষি করা—সারসের ঠোকরে মাথা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ ভেকের উপরে তেজ প্রকাশ করা—বড় তো আর তেজের লক্ষণ নহে ! পর-জাতির ভাব-ভঙ্গী চাল্‌-চোল্‌ বসন-পরিচ্ছদ আত্মসাৎ করিবার অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই যে, "আমাদের স্বজাতি আমাদিগকে যেভাবেই দেখুক্‌ না কেন তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই ! তোমরা যদি একবার আমাদের পানে কটা কটাক্ষে চাও; আর, সেইসূত্রে যদি একবার তোমাদের শ্রীমুখ হইতে এইরূপ একটি অর্দ্ধ-স্ফুট আশ্বাস-বাণী উথলিয়া উঠে যে 'হাঁ ! এই ঠিক ! perfect gentleman !' তাহা হইলে আমাদের মনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সেইদণ্ডেই বরফ-জল হইয়া যাইবে !" ইঁহাদের এই সব ভাব-গতি দেখিয়া আমি অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইঁহারা পিত্তের দল তত নয়—অগ্নির দল তত নয়—যত বায়ুর দল ! কেননা অগ্নির তেজ থাকা চাই—ইহাঁদের তেজ কোথায় ? ইহাঁরা বুক ফুলাইয়া যতটা তেজের ভান করেন তাহার সিকির-সিকি তেজ যদি ইহাঁদের মনের এক কোণেও থাকিত, তবে কি এঁরা পরজাতির পদধূলি বক্ষে লেপন করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইতেন ? সত্য-সত্যই যদি ইহাঁদের তেজ থাকিত তবে ইহাঁরা, উল্টা আরো, এইরূপ বলিতেন—"কি ! জন্‌ বৃষভ আমাদের দেশকে বার্ষভ চক্ষে দেখে বলিয়া

আমরাও কি আমাদের দেশকে বার্যন্ত চক্ষে দেখিব? আপনাদের পৈতৃক ভূমিকে আমরা মাতৃ-সম্বোধন না করিয়া বাঁদি সম্বোধন করিব?" * কিন্তু এরূপ পুরুষোচিত তেজ ইঁহাদের কোথায়? গলাসী (collar) গলায় বাঁধিবার সময় এবং টানিয়া-টুনিয়া আঙ্গরাখার (shirt এর) বুক ফুলাইয়া তুলিবার সময় ইঁহাদের যত কিছু তেজ! ইঁহাদের তেজের সহিত আর আর জাতির তেজের প্রভেদ বিলক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়; দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জাতির তেজঃপ্রভাবে তাহাদের স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ইঁহাদের তেজপ্রভাবে স্বজাতির মাথা হেঁট হয়! এ তেজকে তেজ বলা, আর, কেঁচো'কে কেউটে বলা দুইই সমান! এই জন্য আমি বলি যে, ধোঁড়া হিন্দুরাও শ্লেষ্মার দল নহে,—ধোঁড়া সাহেবেরাও পিত্তের দল নহে; উভয়েই বায়ুর দল—উভয়েই না এদিক্ না ওদিক্; না এপক্ষ না ওপক্ষ; উভয় পক্ষই অনুভয়পক্ষ! দোঁহার মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া কাণা হ'ন—কাঁচিয়া গোঁড়ার দলে মিশিয়া গোঁড়ামি করেন—যাঁহারা একালকে গলা টিপিয়া বধ করিয়া সেকালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন—তাঁহারা শ্লেষ্মাতুর স্যাঁতসেঁতে

* মার্কিন দেশীয় লোকেরা Englandকে Mother-country বলে, আপনাদের দেশকে Mother-country বলে না; জর্ম্মানেরা আপনাদের দেশকে Father-land বলে, Mother-land বলে না; আমরা আমাদের আদিম বাসস্থানকে পৈতৃক-ভিটা বলি, মাতৃক ভিটা বলি না। ইহার অবশ্য একটা নিগূঢ় কারণ আছে। যে-কারণে পৈতৃক-ভিটাকে মাতৃক-ভিটা বলা অবিধি, সেই কারণে পৈতৃক ভূমিকে মাতৃভূমি বলা অবিধি; কেন না, তাহাতে ভাবেগতিকে এইরূপ বুঝায় যে, পিতারা যেন কোন কার্য্যের ছিলেন না—তাই আমাদের জন্মভূমির বিশেষণ স্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে আমরা লজ্জিত! জন্মভূমিকে মাতা বলিয়া সম্বোধন সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হতভাগা বঙ্গদেশের একটি নূতন সৃষ্টি।

জোলো-বায়ু; আর যাঁহারা জাত-সাহেবের ধামা ধরিয়া চলিয়া ভেক-বর্গের নিকটে ধেঁাড়ামি করেন—এ দেশকে গলাটিপিয়া বধ করিয়া ওদেশকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সচেষ্ট হ'ন তাঁহারা পিত্তানুকারী প্রতপ্ত বায়ু। এই দুই প্রকার বায়ুর মধ্যে তুমুল আড়াআড়ি চলিতেছে! দুই পক্ষই অনুভয় পক্ষ—দুই পক্ষই কাজের বা'র! কেননা মনোরথে ভর করিয়া একাল হইতে সেকালে উড়িয়া গিয়া সেখান-হইতে একালের উপরে মান্ধাতার আমলের আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনো ফল দর্শিতে পারে না, আর, এ দেশ হইতে ও দেশে উড়িয়া গিয়া সেখান হইতে এ দেশের উপরে বিলাতি আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনো ফল দর্শিতে পারে না; লাভের মধ্যে কেবল ফুঁয়ে ফুঁয়ে টক্‌রাটক্‌রি লাগাইয়া দিয়া—গরম বায়ু এবং ঠাণ্ডা বায়ুর মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিয়া—বঙ্গসমাজে গৃহ-বিচ্ছেদের Cyclone ডাকিয়া আনা হয়। এইরূপ স্থলেই অনুভয়পক্ষ বিভেদীপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। বিভেদীপক্ষের প্রাবল্যই বায়ুর প্রকোপাবস্থা—এবং তাহাই সমাজের বায়ুরোগ। কিন্তু অনুভয়-পক্ষের কোটায় বিভেদী-পক্ষ যেমন একটি, তেমনি আর দুইটি অবান্তর পক্ষ আছে; কী? না উদাসীন-পক্ষ এবং মধ্যস্থ-পক্ষ। বিভেদী-পক্ষ ঝোড়ো বায়ু—তাহা এক-দিকে শ্লেষ্মার নদীতে তুফান উঠায়, আর একদিকে তীরোপান্তবর্ত্তী পিত্তের দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া তোলে—এইরূপে জলে অনলে বিবাদ বাধাইয়া দেয়; জলকে চাগাইয়া দেয় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে—অগ্নিকে উস্কাইয়া দেয় জলকে শোষণ করিতে! এই গেল বিভেদী-পক্ষ।

উদাসীন পক্ষ কি? না স্থির বায়ু—তাহা ভূলোক এবং দ্যুলোকের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে।

মধ্যস্থ পক্ষ কি? না ধীর বায়ু—মলয়-সমীরণ। এ বায়ু—রস এবং তেজ উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ বাঁধিয়া দিয়া সমাজকে সরস এবং সতেজ করিয়া

তোলে, এইরূপে সমাজে নব-জীবনের সঞ্চার করে ; এইটি যখন হয়, তখন তাহারই নাম সামাজিক রোগের আরোগ্য।

ফল কথা এই যে, যেখানে উৎপত্তি সেইখানেই নিবৃত্তি ; বায়ুই রোগের জন্মদাতা এবং বায়ুই রোগের প্রশামক। শরীরে এমন রোগ নাই যাহা বায়ুর (Nervous fluidএর) প্রকোপ হইতে জন্মিতে না পারে ; আর, এমনো রোগ নাই যাহা বায়ু সমতা-প্রাপ্ত হইলে প্রশমিত না হয়।

রোগের মূল এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল ; কি ? না বায়ুর প্রকোপ। অতঃপর তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ তাহার প্রতি মনো-নিবেশ করা যাইতেছে।

কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ, তাহা সাঁটে-সোঁটে এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে ; তাহা আর কিছু না—উদাসীনপক্ষ হইতে মধ্যস্থ-পক্ষে অবতীর্ণ হইয়া দুই পক্ষের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

প্রথমে, এপক্ষ এবং ওপক্ষ দুইপক্ষ হইতেই ঊর্দ্ধে উঠিয়া- উদাসীন পক্ষের শূন্যে ভর করিয়া থাকিয়া—দুই পক্ষের কাহার কিরূপ ভাল মন্দ তাহা স্থির-চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা ; তাহার পরে, সেই শূন্য-প্রদেশ হইতে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

বিরোধ ভঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা, তাহা এই,—প্রথমে বিরেচক [purgative] ঔষধি দ্বারা দুই পক্ষের দুইরূপ বিভিন্ন জাতীয় দোষাংশ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ; তাহার পরে সৌহার্দ্দের প্রলেপ দিয়া দুই পক্ষের দুইরূপ বিভিন্ন-জাতীয় গুণাংশ একত্রে জোড়া লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় করা।

ও-পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি—স্বেচ্ছাচার ঔদ্ধত্য এবং স্বদেশের রসানভিজ্ঞতা।

এ-পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি—নির্বিচার গতানুগতিকতা [এক কথায়-জড়তা], অকর্ম্মণ্য কৌলিক দাম্ভিকতা ; আর, ঊনবিংশ-শতাব্দীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসানভিজ্ঞতা [এক কথায়—একালের রসানভিজ্ঞতা] ; দুই পক্ষের এইরূপ দুই প্রকার দোষাংশ সমাজ হইতে অপসারণ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

তেমনি আবার ওপক্ষের প্রধান গুণ তিনটি ; প্রথম, স্বাধীন চিন্তা (ইহা কৃত্তিম ধর্ম্ম-শাস্ত্র, গুরুগিরি, এবং ভণ্ডামির বিরোধী) ; দ্বিতীয়, স্বাধীন চেষ্টা (ইহা পরাধীন বৃত্তিতার বিরোধী ;—পরাধীন বৃত্তিতা অর্থাৎ জীবিকার জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা—আত্মীয় স্বজনের গলগ্রাহিতা ইত্যাদি) ; তৃতীয়, ঊনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসগ্রাহিতা।

এ পক্ষের প্রধান গুণ তিনটি ; প্রথম, হিতৈষী গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ; দ্বিতীয় স্বজন-প্রিয়তা ; তৃতীয়, স্বদেশীয় সদাচার এবং ভদ্র রীতিনীতির রসগ্রাহিতা।

দুই পক্ষের এইরূপ তিন তিন প্রকার গুণাংশ সমাজের তিন তিন স্থানের তিন তিনটি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি ; সদ্‌ভাবের প্রলেপ দিয়া সেই সব স্থানের সেই সব বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি একত্রে জোড়া লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা সাধন করা চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

এইরূপে, প্রথমে বিরেচক ঔষধি দ্বারা একালের দোষ এবং এদেশের দোষ দুইই সমাজ হইয়ত বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক ; তাহার পরে এদেশের গুণের সহিত একালের গুণ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হউক্ ; তাহা হইলেই সোণায় সোহাগা হইবে, এবং বঙ্গ-সমাজের সমস্ত আধিব্যাথা নির্ব্ব্যাথা হইবে।

বাবুর গঙ্গাযাত্রা

হাতে কাজ না থাকিলে, আমি তো জানি, লোকে গঙ্গাযাত্রা করে দুজনা'র একজনকে—হয় জ্যাঠাকে—নয় খুড়াকে ; কিন্তু তুমি গঙ্গাযাত্রা করিবার দোস্‌রা লোক খুঁজিয়া না পাইয়া বাবু-বেচারীটিকে উচ্চপদারূঢ় জ্যাঠা এবং খুড়া'র মাঝখান হইতে টানিয়া হেঁচড়িয়া ভূতলে নাবাইয়া, ধরিয়া-বাঁধিয়া নিমতলা মুখো খাটে চড়াইয়াছ ? ভাল ! ভাল !

বলিলাম তো "ভাল ! ভাল !"—দেখি, মনটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া ! পাগ্‌লা মন চক্ষু ঠারিয়া বলিল,—"উনি কলি'র বীর মহারথী ! C. S. I. (অর্থাৎ ছি-এ-ছাই) রহিয়াছে মস্ত এক উপাধি উঁহার স্পৃহনীয় মৃগতৃষ্ণিকা ;—তা ছাড়া G. C. S. I. রহিয়াছে—রাজা মহারাজা রহিয়াছে,—Sir রহিয়াছে,—Gentleman রহিয়াছে,—সবই গিল্‌টি-করা সোনার গয়নার ন্যায় অধম-তোষা, অর্থ-শোষা শাঁস-বর্জ্জিত খোসা —ও গুলার একটা-কাহকে বয়্‌কট্‌ করুন্‌ দেখি কেমন উনি বীর মহারথী ! তা'তে খুব শ্রায়না ! উঁহার যত চোট্‌ নিরপরাধ 'বাবু' উপাধির উপরে ! 'বাবু' উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই মল্‌মলের ন্যায় তাহা ডাহা দেশী জিনিষ।" মন এ যাহা বলিতেছে, তাহা নেহাত ফ্যালনা সামগ্রী নহে—তাহার ভিতরে শাঁস আছে। কিন্তু ওটা পাগলা-মিয়া—ও'র কথা আমি বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে যে, বাবুর গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া বীর মহারথীরা মস্ত একটা রাজনৈতিক খেলা খেলিতেছেন,—মহামন্ত্রী

বিস্‌মার্কের ন্যায় মনের অগাধ নিম্নস্তরে একটা দুরূহ মৎলব আঁটিয়া তুখোড় ওস্তাদী ঢঙের পাকা চাল চালিতেছেন! তাহা যদি হয়, তবে আমার ঘাট হইয়াছে! ঘট-কলসের ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা আমি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতে পারি, কিন্তু এট্‌না বা বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের পেটে কি আছে, তাহার অন্ধি-সন্ধি তলাইয়া পাওয়া আমার ন্যায় স্থূলদর্শী লোকের কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ যখন আমি রাজনৈতিক পাকা চালের নূতন নূতন নমুনার একটার পর আর একটা ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া এক দিকে দুঃখে খেদে এবং আর এক দিকে বিস্ময়ে কৌতুকে এমনি আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, হাসিব কি কাঁদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। বেশী না—দুইটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই আমি তৃতীয় নমুনা দেখাইবার নাম করিবামাত্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলিবে

“আর কাজ নাই!
বস্ কর ভাই”!

(১) বিলাতী পাকা চালের নমুনা।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় Congressএর মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন তদুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নব্য শ্রেণীর যুবকবৃন্দ দলে দলে যুটিয়া বল্লম হস্তে করিয়া ভীষণ রণমত্ত ভাবে মহাবীর সাজিয়াছিলেন। যেন ইংরাজ রাজপুরুষেরা এমনই দুগ্ধপোষ্য বালক যে, পুৎলাবাজির পুতুলের বন্দুকের আওয়াজে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ব্রিটানিয়া মায়ের ক্রোড় দুই হস্তে আঁকড়িয়া ধরিবেন;—এমনিই চোকে-ছানি-পড়া বৃদ্ধা অবলা যে, সোনার সাপকে জ্যান্ত সাপ মনে করিয়া “মা গো” “বাবা গো” বলিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবেন! এটা হচ্চে কন্‌গ্রেস্ মহাসভার বঙ্গীয় অভিভাবক বা অভিনায়কদিগের একটা প্রবীণ গোচের পাকা চাল।

(২) দেশী পাকা চালের নমুনা।

কন্‌সেণ্ট্ বিলের মহামারী ব্যাপারের সময় নব্য শিক্ষিত মহারথীরা রাতারাতি এমনি অসামান্য কালী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কালীঘাটে পূজা দিবার ছলে তাঁহাদের মধ্যস্থিত দুই একজন ভক্ত-বীর ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে হাড়িকাঠে গলা সঁপিয়া দিলেন;—তাঁহাদের ভক্তির আতিশয্য-বলে হাড়িকাঠ ফুলের মালা হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবে, এ যেন হইয়া বসিয়া আছে! আর, যেন তাঁহাদের হুকুমে লাট্ সাহেবের পিঙ্গল-কুন্তল-শোভিত ধব্‌ধ'বে শ্বেত মুণ্ড সীমলা পর্ব্বতের বিনোদভবন হইতে তারযোগে ছুটিয়া আসিয়া মুণ্ডমালিনী দেবীর চরণকমল অনুতাপাশ্রুতে প্লাবিত করিতে চায় পত্রপাঠ,—না যদি করে তবে বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, তন্ত্র মিথ্যা! এটা হ'চ্চে দেশীয় সর্ব্বরোগ-পোষণী মহাসভার অধিনায়ক বা অভিনায়কদিগের বড্ড একটা সরেস পাকা চাল!

বাবু'র গঙ্গাযাত্রা কি ঐ রকমের একটা রাজনৈতিক পাকা চাল? তা যদি হয়, তবে তুমি বোঝো-গে-নিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল—আমাকে দাও অব্যাহতি! কেন না,আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাব। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ বাবু'র গঙ্গাযাত্রা যদি মস্ত একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু নিরপরাধ 'বাবু' উপাধিটির উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জল্লাদি কাণ্ড করিয়া হস্তকে কলুষিত করিবার কী এত তোমার গরজ্ পড়িয়াছে, সেইটি আমাকে ভাঙ্গিয়া বলো! 'বাবু' শব্দ 'বাবা' শব্দের পাঠান্তর তা জানো? "না" বলিতেছ কোন্ লজ্জায়? হরি হরি! তবে কি ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার ক অক্ষর তোমার নিকটে গোমাংস? তবে কি, তোমার ন্যায় অত বড় এক

জন গণিত-বিদ্যার M. A. চূড়ামণিকে—"বাবা ও বাবুর মধ্যে শুধু-যে-কেবল আকার উকারের প্রভেদ" এই যৎসামান্য সোজা কথাটা'র একটা কড়াক্কড় গোচের জ্যামিতিক প্রমাণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? মশা মারিতে কামান পাতিতে হইবে? বল যদি কামান পাতিতে, তবে "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া অগত্যা আমাকে তাহা করিতে হয়; কেন না, তাহা আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, তোমার কথা হেলন করিলাম; আর, কৌতুক-দর্শনোৎসুক সভাসদ্‌বর্গ মনে করিবেন,—ভয়ে পিছাইলাম; দুইই আমার পক্ষে অনিষ্টজনক। অতএব, বিধিমত-প্রকারে কামান পাতিতেছি,—অবধান হো'ক :—

নূতন জ্যামিতি

প্রথম অধ্যায়

প্রথম সিদ্ধান্ত

প্রতিজ্ঞা (enunciation)।

বাপা = বাপ

প্রমাণ

মালিনীর প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বুক বাড়িয়াছে কা'র সোহাগে।

কালি দেখাইব বাপা'র আগে॥—ভারতচন্দ্র।

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাপা = বাপ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

বাপা = বাপু

প্রমাণ

গৃহিণী মাতা আদর করিয়া ডাকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে

ডাকেন,—"বাপধন বাছাধন" বলিয়া। আর, গ্রামের ছেলেদিগকে (অর্থাৎ চাষাভূসা লোকদিগকে) ডাকেন "বাপু বাছা" বলিয়া। তবেই হইতেছে যে,

বাপ-বাছা = বাপুবাছা।

অতএব বাপ = বাপু.........ক।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, বাপা = বাপ [প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ]।

এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে, বাপ = বাপু [ক দেখ]।

অতএব এটা স্থির যে, বাপা = বাপু।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

বাবা = বাবু

প্রমাণ

প্রশ্ন

বাপা : বাপু : বাবা : X = কী ?

অর্থাৎ, যে প্রকার ratioতে, বা Reasonএ, বা যুক্তিতে বাপা শব্দ হইতে বাপু শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক্ সেই প্রকার যুক্তিতে বাবা শব্দ হইতে কোন্ শব্দ উৎপন্ন হয় ?

উত্তর

X = বাবু

অর্থাৎ,

বাপ : বাপু = বাবা : বাবু

কিন্তু

বাপা = বাপু [দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে,

বাবা = বাবু

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিভাষিক সংজ্ঞা

প্রথম সংজ্ঞা

(Skeat's Etymological Dictionary হইতে উদ্ধৃত)। "Papa, father, Derived from Latin papa," অতএব papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ ।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা।

(Dictionary হইতে উদ্ধৃত)

"Pope, the father of a church. Derived from Latin papa." তবেই হইতেছে যে, বাবু যেমন বাবা শব্দের পাঠান্তর Pope তেমনি Papa শব্দের পাঠান্তর।

প্রথম সিদ্ধান্ত

প্রতিজ্ঞা (enunciation)

আর্য্য-ভাষা'র বহুধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখায় 'প এ' 'ব এ' পরিবর্ত্তন চলে।

প্রমাণ।

Latin Bibat—সংস্কৃত পিবতি।

তবেই হইতেছে যে,

পিব্ = বিব্

∴ পি = বি

∴ প = ব

পুনশ্চ

সংস্কৃত পিপাসা = প্রাকৃত পিবাসা।

সংস্কৃত কপিল = প্রাকৃত কবিল।

সংস্কৃত কপিথ=প্রাকৃত কবিথ।

সংস্কৃত পূপক=প্রাকৃত পূবক।

অতএব প্রমাণ হইল যে, আর্য্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশাখায় 'পত্র' 'বত্র' পরিবর্ত্তন চলে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা।

'বাবু' আর্য্য-ভাষার শব্দ।

প্রমাণ।

আর্য্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশাখায় যেহেতু প স্থানে ব হইতে পারে,

[বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ]

অতএব

Latin papa=বাবা
পুনশ্চ Latin Pater=সংস্কৃত পিতৃ

এই দুয়ের যোগে পাইতেছি—papa pater=বাবা পিতা।

অতএব, বাবা শব্দ Latin পাপা শব্দের দেশী মূর্ত্তি।

কিন্তু papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ [বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞা দেখ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে, বাবা-শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

বাবা বা-বাবুর ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য-গণ্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি।

প্রমাণ।

১। Sir = Sire = বাবা

২। Lord = hla-ward = breadkeeper = রুটীর বিতরণ-কর্ত্তা = অন্নদাতা পিতা = বাবা।

৩। ফরাসী Monseiur = my Sire = বাবা

৪। ইটালীয় Seignior = Senior = গুরুজনশ্রেষ্ঠ = বাবা

৫। দেশী লোকের নিকটে

পূজ্য শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী = বাবাজী। মঠধারী মোহন্ত = বাবা

৬। Roman Catholic রাজ্যে Romeএর মোহন্ত = pope = papa [বর্ত্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা দেখ] = বাবা [বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ]

অতত্রব প্রমান হইল যে, বাবা-বা-বাবু'র ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য-গন্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসী-দিগের সম্মানসূচক উপাধি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্ত।

বাবু এবং শ্রীযুতের কাহার কি মূল্য, তাহা যাচাই করিয়া দেখা যা'ক।

১। 'শ্রীযুত'-বোল্ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া শেখা সংস্কৃত গৎ। 'বাবা'-বুলি অমৃতং বালভাষিতং' অর্থাৎ বালকের মুখের অমৃত ভাষা।

২। শ্রীযুত' উপাধি জম্‌কালো রঙের পোষাগী উপাধি। 'বাবু' উপাধি সহজ-শোভন আটপৌরে উপাধি।

৩। 'শ্রীযুত' উপাধি ঐশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক। বাবা-উপাধি মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক।

৪। ইঙ্গভূমিতে Anglo-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না Sirকে) আবশ্যক মতে my dear বিশেষণের মাধুর্য্য-রসে গলাইয়া ঘরের লোক করিয়া লওয়া হয়।

বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালী বাবুকে শ্রীযুত বিশেষণের ঐশ্বর্য্যমহিমায় ফাঁপাইয়া তুলিয়া মজ্‌লীসী লোক করিয়া দাঁড় করানো হয়। ইঙ্গ এবং বঙ্গের মধ্যে এইরূপ এপিট-ওপিটের প্রভেদ-মাত্র।

৫। শ্রীযুত-উপাধি লৌকিকতা-বাজারের ত্থাখন্‌সই সামগ্রী। বাবা-উপাধি হৃদয়-খনির মর্ম্ম-ঘাঁসা সামগ্রী।

৬। জাঁক-জমক-ভক্ত অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীযুত উপাধির মূল্য বেশী।

সুরসিক জহরী লোকদিগের কাছে বাবু-উপাধির মূল্য বেশী।

যাচাই কার্য্য তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই করা সামগ্রী মূল্য দিয়া লইবে যে কে, তাহা তো দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা—যেহেতু বাঙ্গালীর আর এক নাম কাঙ্গালী।

Squire উপাধির মূল্য নিরূপণ।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর পরাক্রম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-ইংরাজি-আনা' ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশই যে কম পড়িয়া আসিতেছে, এটা আমাদের দেশের একটা শুভ লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গের এই সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় ডোডো পক্ষীর পদানুসরণ করিয়া অতীতের দুঃস্বপ্ন হইয়া চুকিলেই দেশের হাড়ে বাতাস লাগে। বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে ব্যাঙ্‌রাজ, এক প্রকার উভচর জীব; ইংরাজীতে যাহাকে বলে amphibious creatu e। ইঁহারা চৌরঙ্গীর অন্তঃপাতী আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুঁসড়িয়া থাকিয়া ঘুমের ঘোরে মনে করেন—"স্বর্গে আছি", কিন্তু সে যে স্বর্গ তাহা এক প্রকার ত্রিশঙ্কু'র স্বর্গ—না দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম—'বাঙ্গালী-সাহেব'। বাঙ্গালী-সাহেব একপ্রকার কাঙ্গালী-সাহেব, যে হেতু তিনি সাহেবত্বের কাঙ্গাল। এই উভচর সাহেবেরা এক দিকে যেমন বাঙ্‌লা

বাবু-উপাধির প্রতি খড়্‌গহস্ত—আর এক দিকে তেমনি Angla বাবু-উপাধির ক্যাঙলা। Angla বাবু, কিনা Angla বাবা,—কি না Sire, সংক্ষেপে Sir। কিন্তু Sir উপাধি বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে না; তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্ Knight হওয়া চাই। Squire উপাধি কিন্তু অমনি পাওয়া যায়, হাত মেলিবামাত্রেই—তাহাতে পয়সা লাগে না। যাহাই হো'ক, Squire কম্‌লোক ন'ন্—তিনি হচ্চেন knightএর Shield-bearer কি না ঢাল-বরদার [Skeat's Etymological Dictionary দেখ]। উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা বাঙ্গলা বাবুকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখেন;—তা দেখুন, তাহাতে খেদ নাই। খেদের বিষয় শুধু এই যে, তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্র কাহুকে Anglo Babu হইতে তো মানা করে না! Sir হইতে তো মানা করে না! তাহা তাঁহারা না হ'ন কেন?

কিন্তু তা'ও বলি, ক্যাঙ্‌লা সাহেবেরা যে Angla বাবু হইবেন—তাহার মতন তাঁহাদের যোগ্যতা থাকিলে তবে তো তাহা হইবেন? যোগ্যতার মধ্যে তাঁহাদের ভিক্ষার কাঁহুনিগীত—কেবল কতকগুলা কেতাছুরস্ত ইংরাজি চাল্‌-চোল্, হাত-নাড়া এবং ঘাড়নাড়া'র ঢঙ্, ব্যাঙ্‌রাজি ক্যাঁ কোঁ ভাষা, এই সকল ছাইভস্মে আপাদমস্তক ভরা। এরূপ যাঁহাদের ভিতর ভুও, তাঁহারা Anglo বাবু উপাধি'র প্রতি অর্থাৎ Sir উপাধির প্রতি হাত বাড়াইবেন কোন্ সাহসে? কাজেই তাঁহারা Anglo বাবুর (অর্থাৎ Knightএর) ঢালবর্‌দার সাজিয়া, Squire সাজিয়া, দুধের সাধ ঘোলে মেটা'ন, আর, তাহাতেই তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পা'ন।

আমার সাধ্যানুযায়ী এইরূপ অব্যর্থসন্ধান-গতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান পাতা দেখিয়া পশু-পীড়ন (cruelty to animals) নিবারণী সভা'র সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত আমার একটি পুরাতন বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "মশা-বেচারীদিগের উপর কেন এ দৌরাত্ম্য?" ইহার উত্তরে আমি

তাঁহাকে বলিলাম, "ভাইরে! চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার যদি তুমি দুর্দ্দশা দেখিতে, তবে আমাকে ওরূপ কথা বলিতে না; উল্টা বরং ভন্‌ভন্‌কারী খুদে রাক্ষসদিগকে হাত জোড় করিয়া বলিতে, "মুমূর্ষু বেচারীর উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য?" দুঃখের কথাটি তবে তোমায় আজ ব্যক্ত করিয়া বলি :—

অল্পদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে লিখিত "Sreejut অমুক"। তাহার অনতিপূর্ব্বে ঐরূপ আর একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিয়াছিলাম, "অমুক Esq"। আমার চিরকেলে স্বদেশী নামের উপান্তে বিদেশী লেজুড় লম্বমান দেখিয়া আমার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! না জানি আমি আজ কাহার মুখ দেখিয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম!" ইংরাজী অক্ষরে Sreejut দেখিয়া আমার মনে আর কিছু হইল না,—কেবল ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, উভচর ব্যাংরাজ সাহেবেরা 'বাবু'র প্রতি কেন যে খড়্গহস্ত, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারি। তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্রে বাবু শব্দ নিগরেরই পাঠান্তর, এবং Squire লেজুড় gentleman এর অপরিহার্য্য পশ্চিমাঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দোষে যে স্বদেশী ভাণ্ডারীদিগের কোপদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা আমি বুঝিতে পরাভব মানিলাম। আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি ব্যাংরাজি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত?

মস্ত এক জন নামজাদা ব্যাংরাজ আমাকে একবার নাক মুখ শিট্‌কিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বাবু-উপাধিটাকে আমি দু চক্ষে দেখিতে পারি না!" আমি বলিলাম, "অপরাধ!" তিনি বলিলেন যে, "আফিসের সাহেবেরা যখন অধীন কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" "ব্যাবু" বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাঁহাদের ঐরূপ আহ্বানধ্বনি আমার কর্ণে শূল বিদ্ধ করে।" চমৎকার Logic!

যাহাই হৌ'ক্—তিনি নকল সাহেব বৈ ত না! তাঁহার গুরুবংশীয় আসল সাহেবদিগের Logic আর-এক-রূপ। ইংরাজি আফিস অঞ্চলে বাঙ্গালী কেরাণীরা যেমন ব্যাবু-নামে বিখ্যাত, ফরাসী দেশের হোটেল্ অঞ্চলে তেমনি যে-সে-শ্রেণীর ইংরাজ "Milord" নামে বিখ্যাত। ইংরাজী Lord সাহেবেরা যদি ব্যাংরাজি মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা বলিতেন, "Lord উপাধিটা অতি জঘন্য! রাজ্যশুদ্ধ continental লোকেরা 'Milord' 'Milord' বলিয়া সম্বোধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব শুনিবে? যত সেখানকার ভবঘুরে ইংরাজ—যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, বাপ-মা'র ঠিকানা নাই—ব্রিটানিয়া মাতা'র সেই সকল হতভাগা কুলাঙ্গার-দিগকে! আজ হইতে আমি কদর্য্য Lord উপাধিটাকে টেম্‌সের জলে বিসর্জ্জন দিয়া Monsieur উপাধি পরিগ্রহ করিলাম।" কিন্তু ইংরাজ সাহেবেরা তো আর ব্যাংরাজ সাহেবদিগের চেলা নহেন! উল্টা আরো তাঁহারা মনে মনে হাস্য করিয়া বলেন এই যে, "ইংরাজী বুলি কপ্‌চাইতে গিয়া Foreignerএরা যে কোনো ইংরাজিশব্দ যেরূপ ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করুক্ না কেন, আর তাহা যে-কোনও অর্থেই ব্যবহার করুক্ না কেন—তাহাদের মুখে তাহা শোভা পায়।" আরো বলেন এই যে, "আমাদের দেশের লোক যখন কোনও ফরাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাসী ভাষায় গৃহপতির সহিত মিষ্টালাপ করে, তখন ফরাসী চাকর চাক্‌রাণীরা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বেজায় রকমের হাস্য বিদ্রূপ করে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি! তাহাদের হাস্য বিদ্রূপ থোড়া-ই কেয়ার করি!" ব্যাংরাজ সাহেবদিগের এ বোধ নাই যে, কোনো এক জন গোরাখালাসী—যাহার কাণ্ডজ্ঞান এম্নি কম যে, সে নারিকেলের ছোব্‌ড়া'কে শাঁস মনে করিয়া দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে সুরু করে, সে-মানুষ নারিকেল ফলকে তিক্ত বলিবে না তো আর কি বলিবে? কিন্তু তা বলিয়া দিশী

লোকে নারিকেল ফলকে হেয়জ্ঞান করিবে কেন? যাহারা বাবু-শব্দের না জানে মর্য্যাদা—নাজানে উচ্চারণ, তাহারা আফিসের কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" বলিবে না তো আর কি বলিবে? আমরা ইংরাজকে বলি sir, ইংরাজেরা আমাদিগকে বলে "বাবু", অর্থাৎ বাঙ্গালি sir, ইহাতে দোষ-টাই বা কি—তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।

ব্যাংরাজি Logicএর এই তো শ্রী—ব্যাংরাজি Ethicsএর শ্রী আবার তাহা চাহিতেও আর এক কাটি সরেস।

ব্যাংরাজি Ethitsএর নমুনা!

বাবুগিরি, বিলাসিতা'র আর এক নাম।

অতএব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা দেশহিতৈষী লোকের কর্ত্তব্য!

উত্তম Ethics, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাদের হাতে কাজ নাই, তাহারা ঐ নূতন Ethicsএর দোহাই দিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে যে

জ্যাঠামি ইচড়েপক্কতা'র আর এক নাম।

অতএব জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা করা ভাইপোদের কর্ত্তব্য।

গঙ্গাযাত্রা-করনেওয়ালাদের জানা উচিত যে, যাহারা জ্যাঠামি করে (অর্থাৎ জ্যাঠার অভিনয় করে, বা সঙ সাজে) তাহারাও জ্যাঠা; আর, যিনি বাপের ভাই, তিনিও জ্যাঠা; নকল-জ্যাঠা'র দোষে আসল-জ্যাঠা'কে হাত-পা বাঁধিয়া জলে ভাসইয়া দিতে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে না। তেমনি, যাঁহারা বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ বাবুর অভিনয় করেন, বা সঙ্ সাজেন) তাঁহারাও বাবু; আর, যাঁহারা দেশের পিতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক, বা মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তাঁহারাও বাবু; ও-বাবু'র দোষে এ-বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, এরূপ ধর্ম্মনীতি বেদেও নাই, কোরাণেও নাই।

যুক্তির বদলে গায়ের জোর

গায়ের জোর বলে কাহাকে ? যে মহাবীর না-মানেন বেদ, না-মানেন কোরাণ, আর, ইংরাজিতে যাহাকে বলে "Rhyme or reason" তাহার না-ধারেন ধার—যাঁহার আপনার কথাই পাঁচ কাহন, তাঁহারই নাম গায়ের জোর। গায়ের জোর বলে এই যে, "বাবু" উপাধি মুসলমান-দিগের প্রসাদি উপহার। বাবা পারসীক ভাষার শব্দ, তাহা না জানে কে? আপামর সাধারণ সবাই তাহা জানে;—অতএব এ কথা মুখে উচ্চারণ করিও না যে, বাবা শব্দ দেশী শব্দ।"

যুক্তি বলে এই যে, বাবা বা papa-ধাঁচা'র পিতৃবাচক শব্দ যখন সাধারণতঃ সকল আর্য্যভাষাতেই আছে, তখন তাহা পারসীক ভাষাতেও থাকিবারই কথা; কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না, দেশী বাবা শব্দ পারসীক বাবা শব্দ হইতে ধার করিয়া পাওয়া। Door ইংরাজি শব্দ, আর, দুওর (সংক্ষেপে দোর্) বাঙ্গালা শব্দ; কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা দোর্ নকল-door, ইংরাজি doorই আসল দোর্। তেমনি, Brother শব্দ ইংরাজি শব্দ, আর ব্রাদার শব্দ পারসী শব্দ; তাহাতেও এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ইংরাজি Brother-শব্দ নকল-ব্রাদার, পারসীক ব্রাদার শব্দই আসল Brother। tu লাটিন্ শব্দ, আর, তু (বাঙ্‌লা তুই) হিন্দুস্থানী শব্দ; তাহাতেও এরূপ প্রমাণ হয় না যে, দেশী তু নকল-tu, Latin tu আসল তু। তা ছাড়া আরেকটি কথা এই যে, ইংরাজেরা যেমন ফরাসীস্‌দিগকেই Monsieur বলে, তা বই আপনাদের দেশের লোককে Monsieur বলে না, মুসলমানেরা তেমনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু-দিগকেই "বাবু সাহেব" বলে, আপনাদের জাতভাইদিগের কাছু'কে "বাবু সাহেব" বলে না। আবার ইংরাজেরা Smith সাহেবকে যেমন বলে Mr.

Smith, বোস্‌জা মহাশয়কে তেমনি বলে Mr. Bose ; তথৈব,মুসলমানেরা যেমন আপনাদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জাতভাইদিগকে মিঞা-সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে, তেমনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দুলোকাদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিবার সময় সাহেবের সঙ্গে "বাবু" জুড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে বাবু সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সব দেশেই করা হয়

(১) দুয়ের এক :—

হয় আপনাদের দেশের প্রচলিত উপাধি অন্য দেশীয় নামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়—যেমন "Mr." Bose, বাবু "সাহেব" ; নয় দেশী নামের গাত্রে দেশী উপাধি জুড়িয়া দেওয়া হয় যেমন "Monsieur" Renan, "বাবু"-সাহেব। এই গেল দুয়ের এক। দুয়ের বার কি—তাহাও বলি ;—

(২) দুয়ের বা'র।

যাহা আপনাদের দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; আর যে দেশের লোকের নাম উচ্চারণ করা হইতেছে সে দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; এইরূপ দুয়ের বা'র গোচের উপাধি দেশী নামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া'র রীতি সসাগরা পৃথিবীর কোনো স্থানেই আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বাবু উপাধি মুসলমানদের স্বদেশীয় উপাধি নহে, তা তো জানই ; আর তুমি বলিতেছ যে, তাহা কোনো কালেই আমাদের দেশেরও স্বদেশীয় উপাধি ছিল না ; তবে কি বাবু উপাধি দুয়ের বা'র ? তবে কি বাবু উপাধি—কোথাও কিছু নাই হুড়ুৎ করিয়া—আকাশ হইতে পড়িয়াছে ? এরূপ একটা সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্ত বেদেও লেখে না—কোরাণেও লেখে না। অবশ্যই, বাবু উপাধি কোনো না কোনো আকারে দেশের মধ্যে প্রচলিত

ছিল—তা নহিলে দেশী নামের স্কন্ধে বাবু শব্দ চাপাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজনই হইত না।

এক যাত্রায় পৃথক ফল।

সকল আর্য্যভাষাতেই পিতৃবাচক শব্দের ন্যায় মাতৃবাচক শব্দও জোড়া জোড়া। তাহার নমুনা :—

Mother Mamma

মাতৃ মা

এরূপ স্থলে, যদি দেশী আর্য্যভাষায় বাবা শব্দের স্থান খালি থাকে তবে একযাত্রায় পৃথক ফল অনিবার্য্য। এইরূপ সার্ব্বদেশিক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে, "এক যাত্রায় পৃথক ফল" দোষ ঘাড় পাতিয়া লইয়া, গায়ের জোরে আপনার কথাকেই পাঁচকাহন করিতে হইবে—এ সর্ব্বনেশে পণ!

কৈফিয়ত তলব।

তুমি চাও জানিতে যে, বাবার বদলে বাবু হইল কেন? বাবা বাবাই থাকিল না কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, দেশী শব্দের সময়োচিত ভাঙন-গড়ন এমন কোনো নূতন কার্য্য নহে যে, তাহার জন্য সেকালের সহজ প্রকৃতি ভাঙন-গড়ন-কর্ত্তাদিগকে একালের অর্দ্ধশিক্ষিত বিদ্যাবৃহস্পতিদিগের নিকটে কড়াক্কড় কৈফিয়ত দিতে হইবে—রীতিমত কারণ দর্শাইতে হইবে। দেশীয় শব্দের দেশোচিত এবং কালোচিত ভাঙন-গড়নও নূতন নহে, আর, তাহার কারণও নূতন নহে—কারণ জিজ্ঞাসাই নূতন; কারণ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কোন্ দিন হয় তো বলিবেন যে, লোকে রাঁধা-চাউলকে রাঁধা-চাউল না বলিয়া রাঁধা-ভাত বলে কেন? কারণ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি তাঁহার চক্ষু হইতে সঙ্কীর্ণতার ঠুলি খুলিয়া ফ্যালেন, তাহা হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যে কারণে ইংলণ্ড দেশে

Master শব্দের জায়গায় Mister (অর্থাৎ Mr.) শব্দের চলন হইয়াছে ; Sire শব্দের জায়গায় Sir শব্দের চলন হইয়াছে ; সারা ইউরোপ আমেরিকায় papa শব্দের জায়গায় pope শব্দের চলন হইয়াছে ; সেই কারণেই আমাদের দেশে বাবা-শব্দের জায়গায় বাবু শব্দের চলন হইয়াছে—দোস্‌রা কোনো কারণে নহে। তুমি কিন্তু ওরূপ একটা সাধারণ কারণে সন্তুষ্ট নহ, তুমি চাও বিশেষ কারণ জানিতে। তুমি চাও জানিতে—বাবা শব্দের আকারের জায়গায় আর-কিছু না হইয়া (ইকার বা একার বা ওকার না হইয়া) উকার হইল কেন? তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পাঁচালী-কর্ত্তা দাশরথি রায়কে তুমি দাশি রায় বা দাশো রায় না বলিয়া দাশু রায় বলো কেন? ক্ষেত্র বাবুকে ক্ষেতি বাবু বা ক্ষেতো বাবু বা ক্ষেতে বাবু না বলিয় ক্ষেতু বাবু বলো কেন? দাশরথি রায়কে তুমি যদি আদর করিয়া "দাশু রায়" বলিতে পারো, তবে দেশের বাবাস্থানীয় লোকদিগকে লোকে আদর করিয়া বাবু বলিতে না পারিবে কেন? কৈফিয়ত তলব তো আর তোমার একচেটে পণ্য সামগ্রী নহে—কৈফিয়ত তলবে অপর লোকেরও অধিকার আছে। তবে তুমি এ কথা বলিতে পারো যে, আজিকের বাজারে দিশী আদরের পসার নাই মূলে ; আজিকের কালে দেশীয় উচ্চপদও তুচ্ছ সামগ্রী, আর, বিদেশীয় মস্‌মস্‌কারী পদ (যাহা নামে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নধারী না হইলেও কাজে—ধ্বজও বটে, বজ্রও বটে, অঙ্কুশও বটে) তাহাই সেরা পূজার সামগ্রী। শক্ত কাল পড়িয়াছে! আজিকের কালের রাজা-রাজ্‌ড়াদিগের রাজসংসারে দিশী রাণী অপেক্ষা বিদেশী চাকরাণীর মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য শতগুণ বেশী ; বঙ্গের রঙ্গভূমিতে দেশের বাবাদিগের বাবু উপাধি অপেক্ষা বিদেশের বাবাদিগের Sir উপাধির মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য শতগুণ বেশী। তবে, শ্রীযুতের কথা স্বতন্ত্র! শ্রীযুত যে খাস সংস্কৃত বুলি! সারা ইউরোপ-আমেরিকায় বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণের পতিত ভূমির চাস আরম্ভ হইয়াছে কেমন প্রবল উদ্যমে, তাহা

কি দেখিতেছ না? অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের নব্য শিক্ষিতেরা সংস্কৃত বিদ্যাকে হুট্ করিয়া উড়াইয়া দিতেন তাহাও তো জানি—তখনকার কালে তাহা শোভা পাইয়াছিল; কেন না তখনকার কালে মোক্ষমূলার ভট্টের নবাবিষ্কৃত "আর্য্য"—সবে মাত্র উড়িতে শিখিতেছে তাই তাহা মৃদুভাবের চিঁ চিঁ-কারী আর্য্য ছিল,—তখন আর্য্যের ডানায় সমুচিত বলাধান হয় নাই। কিন্তু এখন কি আর সংস্কৃতকে হুট্ করা সাজে? এই যুগবিপর্য্যয়ের উপক্রমে গৌরাঙ্গ-বরাহ-অবতারেরা বেদোদ্ধার কার্য্যে যেরূপ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে এখনকার কালে সংস্কৃতকে হুট্ করিতে গেলে হুট্‌করেনওয়ালা নিজেই হুট্ হইয়া যা'ন। ভাগ্যে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ আমেরিকার আসান নজরে পড়িয়াছে—তাই রক্ষে! তা নহিলে শিখাধারী শ্রীযুত উপাধিটি বাবু-উপাধির শনিবারের দোসর হইতে বাকি থাকিত না তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলে, গঙ্গাযাত্রার অধিনায়কেরা যে, কোন্ মহাজনের নিকট হইতে চক্ষের চসমা এবং হাতপায়ের বল ধার করিয়া আনিয়া কাজ চালাইতেছেন তাহা কাহারো জানিতে বাকি নাই; আর এরূপ কৃত্রিমধরণের কাজ যে, বেশী দিন চলিতে পারিবার মতো কাজ নহে, তাহারও কতক কতক আভাস লোকসমাজে অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে এবং ক্রমে আরো অধিকাধিক পরিমাণে দেখা দিতে থাকিবে।

উচ্চ আদালতের বিচার নিষ্পত্তি।

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা সম্ভাষণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিতেছে। যে হেতু, সকল দেশেই যেমন গৃহের ছাঁচে কুল গঠিত, কুলের ছাঁচে সমাজ গঠিত, সমাজের ছাঁচে রাজ্য গঠিত, আর, সেই কারণে, রাজ্যের বাপ মা প্রধানতঃ রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার নীচে উচ্চ শ্রেণীর মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেণীর

ভদ্রলোক; তদ্ব্যতীত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছেলেপিলের দল; বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরূপ। এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া নিম্ন আদালতের বিচারপতি জোরজবরদস্তি করিয়া নিরপরাধ বাবু'র প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের এই যে বিধান জারি করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে তিনি বিচারপতিপদের নিতান্তই অনুপযুক্ত। অতএব, হুকুম হইল,—বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়।

সমাপ্ত